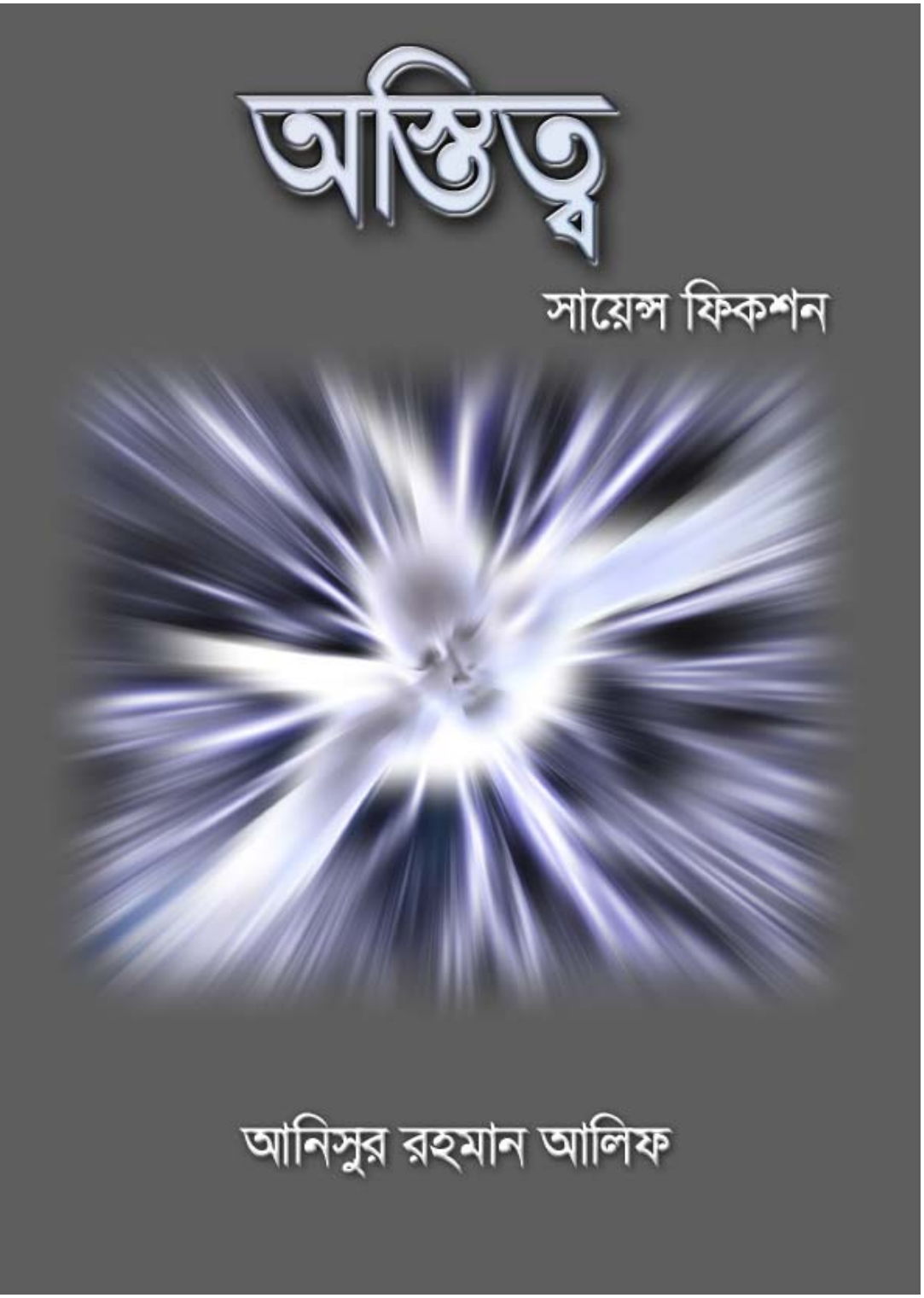

অস্তিত্ব

বিজ্ঞানী ডিমোস ক্রিষ্টালঃ

২১ মে ২১৭৫ সাল। ছয় বছর পূর্বে সংঘটিত হওয়া পঞ্চম বিশ্ব যুদ্ধে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ পারমানবিক দাবানলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর এই বছরের ২৮ এপ্রিল সংঘটিত হওয়া ষষ্ঠ বিশ্ব যুদ্ধে তাবৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে মাত্র এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজারে। পরাপর দুটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণে পঙ্গু আর বিকলাঙ্গ হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে অসংখ্য মানুষ। এ সকল সহায়- সম্বলহীন অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল এখন গভীর ভূ-গর্ভে তৈরিকৃত বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে। বাইরের পৃথিবীর আকাশে বাতাসে এখন শুধু পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তার স্থান। মানুষ তো দুরের কথা পৃথিবী পৃষ্ঠে এখন ক্ষুদ্র একটি ব্যাকটেরিয়ার স্পোরও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলে নতুন কোন স্পোর ঢুকলেও ছাই হয়ে যাওয়া ছাই বর্ণের পৃথিবীটাকে আরও একটু বর্ণহীন করতে সাহায্য করবে। যে সকল নভোচারীরা স্পেস ষ্টেশনে অথবা দুর মহাকাশে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল তারাই কেবল অনন্ত মহাকাশে বাস্তুহারার মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, চির পরিচিত আপন বাসভূমিতে আসার বিন্দুমাত্র সাহস দেখায় না। সমগ্র পৃথিবী পৃষ্ঠ এখন তেজস্ক্রিয়তার প্রচণ্ড তাপে জ্বলছে। ভূ- গর্ভে চলছে প্রতিদিন মৃত্যুর আহাজারি। ভূ- পৃষ্ঠে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে তাতে কোনভাবেই একটু আকাশ দেখার সাধ পূরণ করা সম্ভব নয়। এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে তিন কিংবা চারশত বছর। ভূ- পৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয়তার মান কমতে কমতে যখন দুই শতাংশে নেমে আসবে তখন হয়তো তপ্ত পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়বে বৃষ্টির অমিয় ধারা। হয়তো আবার অঙ্কুরিত হবে চির সবুজ ছোট্ট চারাগাছ। গাছে গাছে ছেয়ে যাবে চিরচেনা সবুজ পৃথিবী, প্রাণে প্রাণে ভরে উঠবে সবগুলো সাগর। এ সকল চিন্তা এখন একটি অস্পষ্ট ধূমায়িত স্বপ্নের মত। আমার ধারণা এই আমরা যেভাবে বেঁচে আছি, হয়তো কোথাও

কোনভাবে কিছু সংখ্যক পশু পাখিও বেঁচে আছে। আমরা যেভাবে এই অমানিশার ঘোর অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে অপেক্ষা করছি হয়তো ঐ সকল পশু পাখিও অপেক্ষা করছে এই দীর্ঘতম প্রতীক্ষার। কোন ভাবে হয়তো চারশত বছর পার করে দেবে ঐ সকল কিছু পশু- পাখি কিন্তু মানুষ কিভাবে এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করবে সেটাই এখন চিন্তার বিষয়। এই বিপুল পরিমাণ মানুষ আগামী চারশত বছর তো দুরের কথা চার বছরের মধ্যেই অনাহারে অর্ধাহারে জীবন দায়িনী অক্সিজেন না পেয়ে সাপের গর্তে পচে গলে মরে যাবে।

একটি বিশাল অংকের মানুষ বেঁচে আছে যাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। ভূ- গর্ভে ভাঙ্গাচোরা বিভিন্ন টানেল আর পারমানবিক বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট ছোট- বড় ফাটলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বেঁচে থাকবার একটু আকুতি নিয়ে নিশাচর প্রাণীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দীর্ঘদিন অন্ধকারে থাকতে থাকতে এই মানুষগুলোর আই মেকানিজমে বিভিন্ন পরিবর্তন চলে এসেছে, অন্ধকারে অল্প অল্প দেখতে পায় ওরা। ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার হিসেবে পশুর মত গ্রহণ করছে বিভিন্ন পোকা- মাকড়, একটু তৃষ্ণা মেটাতে বিভিন্ন ফাটলে জমে থাকা নোংরা- পচা পানি পান করে চলছে আর এভাবেই তৈরি হয়েছে নাম না জানা বিভিন্ন ভয়াবহ রোগ, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, অপর্যাপ্ত অক্সিজেনে ধুঁকে ধুঁকে মরছে মানুষ। মানুষ এখন মরলেই ভাল। ক্ষুধার তাড়নায় নিয়মিত খাদ্যাভাবে একে অপরের শরীরের মাংস এখানে বেশ উপাদেয়। সেই যুদ্ধের সময় যে পোশাকটা শরীরে জড়িয়ে ছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ওটাও ছিঁড়ে গেছে । অর্ধ নগ্ন শরীর আর দীর্ঘদিন গোসল না করে শরীরে পশু পশু গন্ধই বুঝি মানুষকে ধীরে ধীরে পশুতে পরিণত করছে। যুদ্ধের সময় আহত হওয়া মানুষ আর ভূ- গর্ভে ক্ষুধায়, অক্সিজেনের অভাবে, রোগ- শোকে জনসংখ্যা কমে গেছে আরও এক তৃতীয়াংশ। যুদ্ধের চেয়েও এখনকার অবস্থা আরও বেশি ভয়াবহ। গত হয়ে যাওয়া পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধে ভূ- গর্ভে সংঘটিত হওয়া অসংখ্য পারমানবিক হামলার ফলে কিছু প্রাণীর ডি.এন.এ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এই প্রাণীগুলোর

পরবর্তী প্রজন্ম জন্ম নিচ্ছে অনেক বড় আকারের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী হয়ে। নতুন আবির্ভূত এই প্রাণীগুলি খুবই নিরীহ প্রকৃতির, অধিকাংশ সময় দীর্ঘ ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে, এদের শরীরে আঘাত করলেও নড়ে না, যখন জেগে ওঠে তখন খাবার সংগ্রহ করতে ধীর গতির মালবাহী রেলগাড়ির মত পেছনের বগিগুলোকে নিয়ে আশে পাশের প্লাটফর্মে গাড়ী থামায়। যারা একটু সবল প্রকৃতির মানুষ তারা হয়তো দৌড়ে অন্যত্র চলে যায় কিন্তু যে সকল মানুষ একটু বেশি দুর্বল তাদের পা ধরে টানাটানি করতে থাকে, মুখ থেকে এক ধরনের বিষাক্ত লালা ছুড়ে মারে। প্রচণ্ড আঠালো এই লালা মানব শরীরে লাগলে মাকড়সার জালে পোকা যেমন সুতোর প্যাঁচে জড়িয়ে পরে, নড়াচড়া করতে পারে না, ঠিক তেমন অবস্থা হয়। তখন ধীরে ধীরে ঐ দানবাকৃতির সরীসৃপগুলোর মুখ আরও সামনে চলে আসে প্রচুর লালা নির্গত করে, লালায় থাকা প্রচণ্ড ক্ষার দ্রুত মানব ত্বকে ফোসকা সৃষ্টি করে। গোটা শরীর যখন পচে যাওয়া মাংসের মত গলে গলে পড়তে থাকে, রেলগাড়ি তখন তার পেছনের বগিতে মাল লোড করে। কিছু দুর যেতেই আবার থেমে পড়ে, মাল আনলোড না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।

আমার পেছনে মিজরাল বাহিনীর ছয় সাতটি সেনা- রোবট ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে, ওদের হাত থেকে রেহাই পেতে ভূগর্ভের বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ আর ভাঙ্গা কংক্রিট দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে বেড়িয়েছি কিন্তু ওদের না ঘুমানো যন্ত্রচোঁখ ঠিকই আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। ওদের হাতে অত্যাধুনিক লেজার, পেছন থেকে বৃষ্টির মত আলোক রশ্মি আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে, প্রাণ বাঁচাতে পড়িমরি করে দৌড়চ্ছি, হঠাৎ একটি আলো এসে বাম হাঁটুর উপরে লাগল, প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে ঝাপসা দেখলাম আর তখনি পায়ের নিচে থাকা একটি গর্তের মধ্য দিয়ে সরসর করে নিচের দিকে ধাবিত হতে থাকলাম। কতক্ষণ ধরে আমি এই গর্তের ভিতর দিয়ে নিচে নেমেছি, কতটা নিচে নেমেছি, তা আমার মনে নেই। জ্ঞান ফেরার পর দেখি রেল লাইনের পাত এর মত একটি লোহার উপর পড়ে আছি। নিচের

দিকে তাকাতেই শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে আসে। নিচের সারফেস থেকে আমি অন্তত দুইশত ফুট উপরে। পায়ে লেজার লাগার ফলে খানিকটা মাংস পুড়ে গেছে, সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। দশ থেকে বারো ফুট সামনে ছোট্ট একটু জায়গা লক্ষ্য করলাম, লোহার বিম ধরে ধীরে ধীরে এগুতে থাকি। সামনেই ছোট্ট একটা গেট, সুইসের সামনে হাতের ইশারা দিতেই ওটা খুলে গেল, এটা একটা লিফট। আমি গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামার কমান্ড দিলাম। লিফট নেমে যেতে থাকে অনেক নিচে, গেট খুলে যেতে লক্ষ্য করলাম আমি বড় একটি হল ঘরে এসে হাজির হয়েছি। সুইচ বোর্ডের দিকে হাতের ইশারা দিতেই কোমল আলোর বাতিগুলো ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখি সারি সারি কক্ষ, একটি কক্ষের গেট খুলে ভিতরে তাকিয়ে অবাক না হয়ে পারলাম না, বড় বড় ওয়াগন সারি সারি করে সাজানো রয়েছে। একটি ওয়াগন খুলে ভিতরে থাকা বড় বড় বক্স থেকে একটি বক্স খুলে দেখতে পেলাম অসংখ্য ছোট ছোট ইমার্জেন্সী বক্স রয়েছে। একটি বক্স খুলে তার মধ্যে থাকা এইড কিট দিয়ে পায়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ মুছতে থাকলাম, বক্সে থাকা শুকনো খাবার আর পানিয় নিয়ে ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দীর্ঘ ঘুমের পরে শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, উপরের দামি ঝাড়বাতি দেখে সবকিছু মনে পড়ে গেলো। অজানাকে জানার আগ্রহে প্রতিটি রুম পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। পূর্ব দিকের কোনার রুমটিতে প্রবেশ করে ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল, এই রুমটা অনেক বড়, সামনে পেছনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য কঙ্কাল পরে আছে। সামনে কন্ট্রোল প্যানেল দেখে বুঝতে পারলাম এটি একটি সুপার কম্পিউটার । আমি কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে এগিয়ে গেলাম ক্রিস্টাল কি- বোর্ডের সামনে যেতেই উপর থেকে নীলাভ আলো জ্বলে উঠল আর বায়ো- ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশের আলোতে বিভিন্ন তথ্য ভেসে উঠল। সেই দিন এখানে কি হয়েছিল যে এতগুলো মানুষ

একবারে মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিল? তা দেখতে আমি ডাটাবেসে ঢুকে পড়ি, হ্যাঁ এটাই সর্বশেষ ভিডিও ক্লিপ, কিন্তু ভিডিও ক্লিপটি দেখে চোখের জলকে আমি রুখতে পারলাম না, খুবই ভয়াবহ হত্যা কান্ড ছিল এটি। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে হাই নিন গ্যাস ছেড়ে দিয়েছিল এরা। নিজেরা তো মরেছেই সাথে ছোট্ট বাচ্চারাও। ডাটাবেস ঘেঁটে বুঝতে পারলাম এটি একটি পরিত্যক্ত আশ্রয়কেন্দ্র। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে এটি তৈরি করা হয়েছিল, পারমানবিক যুদ্ধের সময় দেশের সবচেয়ে বড় বড় নেতা, সেনাপ্রধান, চিকিৎসক, প্রকৌশলী আর বিজ্ঞানীরা যাতে একটানা এখানে অনেক বছর থাকতে পারে এমনভাবে এটি তৈরি করা হয়েছিল। পঞ্চম বিশ্ব যুদ্ধের সময় মিজরাল ইন্টেলিজেন্স সেনারা যখন ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ চালায় তখন এটির বেশির ভাগ রুমগুলোই ভেঙ্গে যায় কিন্তু কেউই জানত না যে এখানে অন্তত দুইশত বছর জীবন ধারণ করার মত খাদ্য, অক্সিজেন, জ্বালানী, বিদ্যুৎ প্রভৃতি রয়েছে। বড় বড় গবেষণাগার এবং গবেষণাগারের পার্শ্বেই ছিল বড় বড় হল রুম আর সাথে একটি মিউজিয়াম, যার মধ্যে এ যাবত কালে পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে সকল কৌশলের তথ্য সারি সারি করে রাখা ক্রিস্টাল ডিস্কে ধারণ করা আছে। মানুষের দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফসল হিসেবে আজকের অতি- আধুনিক পৃথিবী এবং তার সাথে সাথে সকল আবিষ্কার থেকে কোনভাবেই যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঞ্চিত না হয় বা আদিম যুগের মানুষের মত সব কিছু আবার গুহা থেকে শুরু করতে না হয় সেজন্য এখানে রয়েছে একটি অত্যাধুনিক সার্ভার লাইব্রেরী। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা ব্যবস্থার উপকরণ, প্রচুর জ্বালানী, বড় বড় হলরুম, এবং প্রচুর পরিমাণ খাদ্য, এক কথায় এই ভূ- গর্ভস্থ আশ্রয় কেন্দ্রটি একটি বিশাল প্রজেক্ট ছিল।

ধীরে ধীরে সুস্থ হলে আমি এই আশ্রয় কেন্দ্রটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। আমি বিস্মিত হয়ে যাই যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের সুখের কথা চিন্তা করেছে, একে অপরের সাথে হিংসায় মত্ত হয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে

পারমাণবিক দাবানল, কোথায় তারা? সমগ্র পৃথিবীকে স্তব্ধ করে দিয়ে যারা এখানে সুখে শান্তিতে থাকবে ভেবেছিল, কোথায় তারা? এটা তো একেবারে ফাঁকা, এখানে তো কেউ নেই, এটাই বুঝি বিধাতার খেলা।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান একাডেমী নাম আই.এস.এ। আমি সেখানকার একজন নিম্ন শ্রেণীর সদস্য ছিলাম তাই আমার সৃজনশীল চিন্তা ভাবনার মূল্য সেখানে এবং সমগ্র বিশ্বে কেউ কখনও মূল্যায়ন করে নি। আমি ছিলাম অবহেলার পাত্র। বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতির মুখটা পর্যন্ত আমি কখনও দেখিনি, আমাকে বসতে দেওয়া হতো ধুলাবালিতে জীর্ণ একটি কক্ষে, গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতিগুলো ছিল সব বড় বড় দুর্নীতিবাজদের হাতে। তাই মনের যত সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনা মনেই রেখে দিতাম। প্রকাশ করার মত একজন মানুষও আমার পাশে ছিল না । গোটা পৃথিবী তখন দুর্নীতি আর হিংসায় মত্ত। আমার জানা মতে সেই সকল বিজ্ঞানীরা আর বেঁচে নেই। ওরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অর্থের নেশায় দু- পক্ষকে জীবন বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরিতে মত্ত ছিল। কে কত বেশী অর্থ দিলে কত বেশি মানুষ মারার অস্ত্র দিতে পারে সেটাই ছিল ওদের গর্ব। অথচ বিজ্ঞান একাডেমীর প্রবেশ দ্বারে লিখা ছিল বিজ্ঞান মানুষের আশীর্বাদ সরূপ। ধিক্কার গত হয়ে যাওয়া পৃথিবীর মানুষকে, ধিক্কার বার বার।

আমি এখন ইচ্ছে করলেই এই আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা অত্যাধুনিক শ্যাডোনেট এর মাধ্যমে সকল সরকারী ও বেসরকারি ভূ- গর্ভস্থ কামরার খোঁজ খবর নিতে পারি। ইচ্ছে করলেই ঐ সকল কক্ষে বর্তমান যারা বসবাস করছে তাদেরকে হিট ওয়েভের মাধ্যমে সরাসরি দেখতেও পারি। শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে কোনভাবেই মানুষ আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। এখানে আছে শুধু খাদ্যাভাব, চিকিৎসার অভাব, অক্সিজেনের অভাবে মানুষ এখানে

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সাথে লড়ছে যা এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে, কোন সভ্য পৃথিবী এ দৃশ্য সহ্য করতে পারবে না।

আমি এখন আমার জীবনের জ্ঞান সাধনার সকল অতৃপ্ত বাসনাকে তৃপ্ত করতে শুরু করেছি। মানব কল্যাণের জন্য আমার যত চিন্তা ছিল আজ আমি তা নিয়ে গবেষণা করতে পারছি। এখানে কেউ আমাকে বাঁধা দেয় না। কিন্তু একটি প্রশ্ন বার বার আমার ভেতরে দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করে, কাদের জন্য গবেষণা করব, পৃথিবীর সকল মানুষ তো এখন বিদায়ের ঘণ্টা ধনি বাজাচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা এলো, আমি বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলাম। যতই ভাবছি ততই আনন্দ পাচ্ছি। আমি যদি এই প্রজেক্টটি দাড় করাতে পারি তাহলে হয়তো আবার পৃথিবীর মানুষকে তার চিরচেনা আপন পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে। আমি ক্রমাগত বিষয়টির গাণিতিক সমাধান খুঁজে বেড়াতে থাকলাম । বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে, বর্তমান বিশ্বের ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষের সকল দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটাতে আমি আমার প্রজেক্টটির একটি ফ্লো- চার্ট দাড় করিয়েছি। যার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের মানুষ হয়তো আরও একবার মানুষের মত বেঁচে থাকার সুযোগ পেতে পারে। আমার এই প্রজেক্টটি যদি সফল হয় তাহলে মানুষ হয়তো আবার ভূ- পৃষ্ঠে অবাধ বিচরণ করতে পারবে কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে অন্তত চারশত বছর। কারণ ভূ- পৃষ্ঠে যে পরিমাণ পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে তার আটানব্বই শতাংশ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষই সেখানে যেতে পারবে না। আবার চারশত বছর এই ভূ- গর্ভে মানুষের বেঁচে থাকাও অসম্ভব। আমার তৈরিকৃত ফ্লো- চার্ট অনুযায়ী এই আশ্রয় কেন্দ্রটিতে যে পরিমাণ রসদ আছে তাতে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে হাজার খানেক মানুষকে চারশত বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আমি আমার প্রোগ্রামটি বার বার পরীক্ষা করে দেখতে থাকি, দু- একটি সমস্যা ছাড়া সবকিছু ঠিক আছে। আমি দিন- রাত প্রোগ্রামটি নিয়ে ভাবতে থাকি। প্রথমে প্রয়োজন মত

যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে একটি ভিগা- সুপার কম্পিউটার এর মধ্যে আমার তৈরিকৃত সকল সফটওয়্যারগুলো ইন্সটল করতে থাকি। প্রোগ্রামের কোডিং এ যে বাগগুলো আছে সেগুলো ডিবাগ করে পুনরায় প্রোগ্রাম এডিটিং করে চলি। এভাবে কিছু দিন যাওয়ার পর আমি একটি স্বয়ংক্রিয় নিউরাল নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে সমর্থ হই। একাকীত্ব আর শব্দহীন পরিবেশে নিজের সাথে কথা বলা আর মন লাগিয়ে কাজ করে চলা ছাড়া আমার এখানে আর কোন বাড়তি চিন্তা ছিল না তাই প্রজেক্টের কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলতে থাকল। আমি প্রজেক্টের ফ্লো- চার্টের ধরণ মত যন্ত্রগুলোকে বারবার পরীক্ষা করে দেখতে থাকি। যদিও আমার তৈরিকৃত যন্ত্রটিতে এখনও অনেক বাগ রয়ে গেছে তবুও আমি এটাকে নিয়ে ভীষণ আশাবাদী। আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা বেশ কিছু রোবট নিয়ে ওগুলোর প্রোগ্রামে আমার প্রয়োজন মত প্রোগ্রাম লোড করে সচল করে তুললাম। এবং রোবটগুলোকে আমার তৈরিকৃত ভিগা- সুপার কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্ক করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে লাগলাম, ফলে আমার কাজ আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। বিভিন্ন মেকানিক্যাল, আর্কিটেকচারাল, জেনেটিক্স এবং প্রোগ্রামিং এর কাজে আলাদা আলাদা রোবট ব্যবহার করতে শুরু করলাম। আমার ফ্লোচার্ট অনুযায়ী একটি ডেমো যন্ত্র তৈরি করলাম এবং এটাকে চালিয়ে দেখলাম। কিছু কিছু সমস্যা ছাড়া যন্ত্রটি বেশ কাজ করছে, আমি এটাকে সম্পূর্ণ ত্র“টি মুক্ত করতে দিনরাত পরিশ্রম করতে থাকলাম। অবশেষে আমি একজন মানুষের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হলাম। যন্ত্রটির নাম দিলাম হাইপার টাইম টিউব।

<u>উদ্দেশ্য:</u>

আমার তৈরিকরা ভিগা- সুপার কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত একটি হাইপার টাইম টিউব একজন মানুষকে চারশত বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। এই যন্ত্রটির মেমোরি প্যানেল অংশটি প্রথমে হাইপার টাইম টিউবে থাকা একজন ব্যক্তির মস্তিষ্কে থাকা পূর্বের সকল স্মৃতিকে সেন্ট্রাল ডাটাবেস সার্ভার কম্পিউটারে ট্রান্সমিট করবে । ডাটাবেস সার্ভার কম্পিউটার আবার ঐ সকল তথ্য একটি ক্রিস্টাল ডিস্কে সংরক্ষণ করে রাখবে। সেন্ট্রাল কম্পিউটার যাকে আমরা ভিগা- সুপার কম্পিউটার বলি তার সাথে সর্বদা কথা বলার জন্য ওকে একটি নাম দিলাম ‘ডিপিসি’। ডিপিসি সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে যেমন, দীর্ঘ সময় মানব শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকল প্রকার প্রোটিন আর তার সাথে তার মস্তিষ্ককে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করবে। দীর্ঘ সময়ের জন্য হাইপার টাইম টিউবে থাকা শরীরে কোন প্রকার রক্ত সঞ্চালন করা হবে না কারণ রক্ত সঞ্চালন হলে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে হয় আর হৃদপিণ্ড এই দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারবে না, তাই শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে শরীরকে একটি সুষম তাপমাত্রায় রেখে নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মাধ্যমে মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিটি কোষ নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়ে শরীরের সকল অঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। দীর্ঘ ঘুমে আচ্ছন্ন শরীরটি সাধারণ ভাবে দেখলে মনে হবে নিষ্প্রাণ একটি দেহ, নিষ্প্রাণ দেখালেও শরীর কিন্তু বেঁচে থাকবে। এই পদ্ধতিতে শরীরকে স্থবির করে রাখা সম্ভব কিন্তু মস্তিষ্ককে নি¯প্রাণ, স্থবির রাখা সম্ভব না কারণ আমরা জানি মস্তিষ্ক কখনই চিন্তা ছাড়া থাকতে পারেনা। চিন্তাহীন, কর্মহীন মস্তিষ্ক মানেই মৃত্যু।

মস্তিষ্ক যখন চিন্তা করে তখন এই চিন্তা কোন একক বিষয়কে নিয়ে হয় না। মস্তিষ্ক প্রতিনিয়ত বিভিন্ন চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, এই চিন্তা যখন সু- শৃঙ্খল চিন্তা হয় তখন মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে, আর চিন্তা

যখন দুশ্চিন্তা হয় তখন মানুষ দ্রুত বার্ধক্যের দিকে চলে যায়। বর্তমান পৃথিবীর অনিয়মিত দুশ্চিন্তায় থাকলে সাধারণভাবে একটি মস্তিষ্ক চারশত বছর তো দুরের কথা চার বছরও বেঁচে থাকবে না কিন্তু একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মাধ্যমে পরিকল্পিত চিন্তা দিয়ে একজন মানুষকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। মস্তিষ্ক তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের চিন্তা করে থাকে। এই সকল চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশ কাজ করে। সকল প্রকার অনুভূতি, দেখা আর না দেখা সকল বস্তুর উপরেও মস্তিষ্কের বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের পদ্ধতি নির্ভুলভাবে কোডিং করা রয়েছে। যদি একটি সু-শৃঙ্খল চিন্তা তাকে দিতে হয় তাহলে তার বিভিন্ন অংশগুলোকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তাকে চিরচেনা একটি অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে। চিরচেনা অতি পরিচিত কোন কিছুর কথা চিন্তা করলে পৃথিবী নামক গ্রহটি মানুষ এবং তার মস্তিষ্কের কাছে সবচেয়ে বেশি চেনা এবং আপন। কিন্তু বর্তমানের পুড়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া পৃথিবীর চিন্তার মধ্যে রাখলে মানুষের আয়ু না বেড়ে বরং কমে যাবে কারণ এখানে চাওয়া পাওয়ার ব্যবধানটা অনেক, তাই তাকে রাখতে হবে স্বপ্নের মত একটি জায়গায়, যেখানে সব কিছু হবে সুন্দর, আনন্দময়।

মানুষ প্রতিনিয়ত জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় কোন না কোন স্বপ্ন দেখে। আমার এই যন্ত্র তাকে তার সুখ-স্বপ্নের মত একটি ভার্চুয়াল জগত তৈরি করে দেবে এবং এই জগতের আয়ুষ্কাল হবে চারশত বছর। এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে আমি হাইপার টাইম টিউবে থাকা মানুষটির মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় অংশে একটি একক মাইক্রোচিপ স্থাপন করব, এটি মস্তিষ্কের প্রতিটি অনুভূতির অংশে নিখুঁত কম্পনের সৃষ্টি করে সরাসরিভাবে মস্তিষ্ককে বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি প্রদান করবে, বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি একযোগে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মস্তিষ্কের মধ্যে একটি স্পষ্ট স্বপ্ন তৈরি করবে। এবং স্বপ্নে বিভিন্ন প্রকার চরিত্র তৈরি করা হবে, ভিজুয়াল, সাউন্ড, স্বাদ, গন্ধ, ব্যথা পাওয়া, আরাম

বোধ হওয়া এরূপ অসংখ্য অনুভূতি প্রক্রিয়াকরণের জন্য চিপটির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কন্ট্রোল ইউনিট থাকবে যা আবার আমাদের সেন্ট্রাল কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকবে।

সার্ভার লাইব্রেরী থেকে মস্তিষ্ক সংক্রান্ত তথ্য নিতে গিয়ে দেখলাম গত হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক কে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিল। আমি আমার তৈরি করা যন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম সেন্সর স্থাপন করে জৈবিক সিগনালগুলোকে বাইনারিতে সাজিয়ে নব আবিষ্কৃত জি-১৩ কম্পাইলার এর মাধ্যমে কম্পাইল করে সরাসরি তার কার্যপ্রণালী যাচাই করতে পারি। যেমন মস্তিষ্কের দেখার অনুভূতিকে আমরা এখন খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি। আজ থেকে প্রায় দুইশত বছর পূর্বেই আমাদের বিজ্ঞানীরা জেনেছেন মস্তিষ্ক তার ১৭,১৮,১৯ নম্বর সেক্টর দিয়ে দেখে কিন্তু দেখার অনুভূতির কোড সম্পর্কে তখন আমরা ছিলাম অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে। এখন আমরা জেনেছি আমাদের চোখে যখন কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়ে তখন তা একটি সিগনাল আকারে চোখের পেছনে থাকা নার্ভের মাধ্যমে কায়াজমা করে বিভিন্ন ফাইবার দিয়ে ১৭, ১৮ ও ১৯ নম্বর সেক্টরে চলে যায় এবং ঐ সিগনালকে নির্দিষ্ট করা কোডে রূপান্তরিত করে নির্ভুলভাবে প্রক্রিয়াকরণ করতে থাকে। বস্তুর রং, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, কাছে-দুরে থাকা, আলো কম-বেশি প্রভৃতি প্রতিচ্ছবির জন্য আলাদা আলাদা কোড তৈরি করা থাকে। বিষয়টি এরকম যে একটি মানব শিশু যখন জন্ম নেয়, যখন সে চোখ খোলে পৃথিবীকে দেখে তখন থেকে চোখের উপর যত প্রকার প্রতিচ্ছবি পড়ে প্রতিটি প্রতিচ্ছবির জন্য আলাদা আলাদা কোড মস্তিষ্ক তার স্মৃতি ব্যাংক প্যারাইতাল লোবে সংরক্ষণ করা শুরু করে। ধীরে ধীরে নবজাত শিশুটি বেড়ে ওঠে, সাথে সাথে তার মস্তিষ্ক ও তার স্মৃতি ব্যাংকে কোডের পরিমাণকে পরিপূর্ণ করে তুলতে থাকে, ধীরে ধীরে মস্তিষ্ক তার অন্যান্য সেক্টরগুলোকে ঐরূপ দেখা বস্তুর কোড, শোনা ইন্দ্রিয়ের জন্য বিভিন্ন শব্দের কোড,

অনুভূতির যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে সকল ইন্দ্রিয়ের জন্য আলাদা আলাদা কোড তৈরি করে তার স্মৃতি ব্যাংকে জমা করে। যে কোন ধরনের অনুভূতির সংস্পর্শে এলেই মস্তিষ্ক তখন সেই অনুভূতিটি কিসের তা যাচাই করার জন্য তার স্মৃতি ব্যাংকে থাকা সকল কোডগুলোর সাথে মিলিয়ে অনুভূতির নাম, যুক্তি, প্রশ্ন ও করনীয় নিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করে। ফলাফল পাওয়ার জন্য এই সকল কোডগুলোকে কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন পাথে চালিয়ে বিভিন্ন ইউনিটে নিয়ে এ সম্পর্কিত চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করে। এভাবে মস্তিষ্কের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিভিন্ন অংশ প্রতিনিয়ত কাজ করে চলে। আমার এই প্রজেক্টে আমি একটি পরিণত মানুষের প্যারাইটাল লোবে থাকা ঐরূপ সকল কোডগুলোকে থ্রি জিরো থ্রি প্রসেসরের মাধ্যমে কনভার্ট করে কম্পিউটারের ভাষায় এনে আমার তৈরিকৃত কম্পিউটারের স্মৃতি ভাণ্ডারে রাখব এবং ঐ মানুষটির মস্তিষ্কে থাকা কোডগুলো লোব ইরেজিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মুছে ফেলব। পরবর্তীতে ঐ সকল কোডগুলোকে ডিকোড করে আমার তৈরিকৃত ক্ষুদ্রাকার চিপের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে প্রেরণ করব ফলে কম্পিউটার মেমোরিতে থাকা তথ্য তখন কম্পাইল হয়ে মস্তিষ্ক কে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করবে। যেহেতু ঐ কোড গুলো মস্তিষ্কের নিজস্ব কোড তাই মস্তিষ্ক কোনভাবেই বুঝতে পারবে না যে সে একটি মেশিনের মাধ্যমে মেশিন চালকের ইচ্ছেমত পরিচালিত হচ্ছে। মস্তিষ্কে স্থাপিত চিপটির মাধ্যমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়তে পরিমিত ইলেকট্রনিক আবেশের নিয়ন্ত্রিত প্রবাহের মাধ্যমে মস্তিষ্ককে নিখুঁত বাস্তব জীবনের অনুভূতি প্রদান করা হবে ফলে মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে যেমন স্বপ্ন দেখে যন্ত্রটি সেরূপ নিখুঁত ও নিয়ন্ত্রিত স্বপ্ন তৈরি করবে। এই স্বপ্নে সত্যিকার পৃথিবীতে যত ধরণের অনুভূতি আছে সকল ধরনের অনুভূতিই তখন সে পাবে। এভাবে আমার তৈরিকৃত হাইপার টাইম টিউবে থাকা একটি মস্তিষ্ক ভার্চুয়াল জগতকে পরিপূর্ণ করে তুলবে। সাধারণ পৃথিবীর নিয়মের মত তাকে ভার্চুয়াল জগতে বিভিন্ন কাজ করে যেতে হবে। এই ভার্চুয়াল জগতটি হবে রিয়েল জগতের

মত। এখানে মানুষ জন্ম নেবে, আবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। ভার্চুয়াল বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গত হয়ে যাওয়া বিশ্ব আমার এই আবিষ্কারের কথা শুনলে হয়তো বলতো এটা কখনই সম্ভব নয় কিন্তু আমি বলছি এটা সম্ভব কারণ মানুষ যা দেখেছে যা শুনেছে, যা কল্পনা করতে পেরেছে তাকে বাস্তবায়ন করতে কাজ করেছে এবং এক সময় কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কে কল্পনা করার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মানুষের কল্পনার কোন শেষ নেই আসলে কথাটি ভুল। মানুষের কল্পনা করার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, সৃষ্টিকর্তাকে মানুষ কখনও দেখেনি তাই তার আকার কেমন মানুষ কল্পনা করতে পারে না। যদি কোন মানুষ কে বলা হয় বল সৃষ্টিকর্তার রূপ কেমন ? হয়তো সে বলবে সৃষ্টিকর্তার দুইটা হাত আছে, দুইটা পা আছে। বলবে সৃষ্টিকর্তা দেখতে সাধারণ মানুষের মত, শুধু তার দাড়িটা একটু বেশি লম্বা। শুনতে হাস্যকর শোনালেও মানুষ কিন্তু বাস্তবে এই কথাগুলোই বলবে। কারণ মানুষ কখনও সৃষ্টিকর্তার সত্যিকারের রূপ কল্পনা করতে পারবে না। মানুষের সকল কল্পনা এখানে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের মস্তিষ্কে সৃষ্টিকর্তার রূপ নিয়ে কোন প্রকার তথ্য নেই, যদি ইচ্ছামত কোন কিছু কল্পনা করিও তা বাস্তবে দেখা কোন বস্তুর সাথে মিলে যাবে। তাই আজ আমি যা চিন্তা করছি তার বাস্তবায়ন হবেই কারণ এই বিষয়টি চিন্তা করার শক্তি আমার আছে, যেহেতু চিন্তা করার শক্তি আমার আছে সেহেতু বাস্তবায়ন করার শক্তিও আমার আছে। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা মানুষের কল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে রিয়েল জগতের সকল প্রকার অনুভূতি দিয়ে তাকে একটি নতুন জীবন দেব যা তৈরি করবে সম্পূর্ণ আলাদা একটি সত্তা।

এই প্রক্রিয়াটি হবে খুবই ব্যয়বহুল। যতটুকু রসদ আছে তাতে হয়তোবা হাজার খানেক মানুষকে এভাবে আলাদা আলাদা ভার্চুয়াল

জগতে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব কিন্তু বিপুল পরিমাণ মানুষের দল অচিরেই ক্ষুধায়, রোগে, অপরের খাবার হয়ে, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমার তৈরিকরা হাইপার টাইম টিউবের একটি সিমুলেশন প্রজেক্ট ডিপিসি তৈরি করেছে এর মাধ্যমে দেখা যাবে যে আসলে এটি কিভাবে কাজ করবে। আমি বার বার এটি চালিয়ে দেখলাম কারণ এই প্রজেক্টের উপর নির্ভর করছে আগামী পৃথিবী, এতটুকু ত্রুটিও এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত একটি হাইপার টাইম টিউব তৈরি করার পর প্রজেক্টের প্রয়োজন মত এক হাজার হাইপার টাইম টিউব তৈরির কাজ চলছে। এত বড় প্রজেক্টটি সফল করতে কাজ করে চলেছে বেশ কিছু রোবট ওরা দিন রাত পরিশ্রম করে টিউবগুলোকে নিখুঁতভাবে তৈরি করছে এবং প্রতিটি টিউব দুই হাজার বার করে পরীক্ষা করে দেখছে যে কোন সমস্যা থেকে গেল কিনা।

পূর্বেই বলেছি এই প্রজেক্টের প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে থাকা এ যাবত কালের সকল স্মৃতিকে সেন্ট্রাল ডাটাবেস কম্পিউটারে আলাদা আলাদা ক্রিস্টালে সংরক্ষণ করে রাখা হবে এবং ঐ সকল স্মৃতিকে একটি নেটওয়ার্কের আন্ডারে রেখে প্রতিটি স্মৃতির সাথে প্রতিটি স্মৃতিকে সম্পৃক্ত করে শেয়ার করে দেওয়া হবে যাতে কোন একটি মস্তিষ্কের কোন প্রকার স্মৃতি ঘাটতি পড়লে অন্য একটি মস্তিষ্কের স্মৃতি তা পূরণ করতে পারে। ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট ফ্লোতে আমরা যে ভার্চুয়াল জগতের অবয়বে তাকে ঢেকে রাখব সেটাই তার কাছে সত্যিকার বাস্তব জগত বলে মনে হবে। এই ভার্চুয়াল জগত ছাড়া রিয়েল কোন জগত আছে বা থাকতে পারে এমন কোন কিছু সে কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। ভার্চুয়াল জগতে রিয়েল পৃথিবীর সকল কিছু থাকবে। এখানে দেশ থাকবে, থাকবে রাজনীতি তার সাথে সমান তালে সরকার এবং সরকারের কার্যক্রম। এখানে একজন মানুষ প্রতিনিয়ত লক্ষ কোটি নকল অস্তিত্বের মানুষের সাথে বসবাস

করবে। নকল অস্তিত্বগুলো রিয়েল অস্তিত্বের মত আচরণ করবে, ফলে সে নিজের সাথে সাথে নকল অস্তিত্বগুলোকে বিশ্বাস করবে। আর এই নকল অস্তিত্বের উপর ভর করে প্রতিনিয়ত গড়ে তুলবে একটি সম্ভাবনাময় আগামী পৃথিবী। এখানে মানুষকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে, যেমন নিজেদের মধ্যে কোন প্রকারের সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে আগামী পৃথিবীকে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ ভবিষ্যতে রূপ দেওয়া। এই সকল কাজ তার অগোচরে করা হবে, এই সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে সে কোন চিন্তাই করতে পারবে না। জীবনটাকে একটু ভাল অবস্থানে আনতে সে প্রতিনিয়ত জীবন যুদ্ধে লিপ্ত হবে, এক সময় তার মৃত্যু হবে। আবার একটি লুপিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাকে নতুন করে জন্ম দেওয়া হবে। এভাবে আগামী চারশত বছর পর্যন্ত একটি বিশাল সময় সে নিজের মধ্যে পরিভ্রমণ করে বেড়াবে। এই ভার্চুয়াল জগতে অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি থাকবে যা সে কোনভাবেই ছেড়ে আসতে চাইবে না, তার কাছে মৃত্যুই সবকিছুর পরিসমাপ্তি বলে মনে হবে। চারশত বছর পরে যখন সে তার মূল অস্তিত্বে ফিরে আসবে তখন তার মস্তিষ্কে থাকা ঐ চারশত বছরের সকল প্রকার স্মৃতি মুছে ফেলা হবে, কিছু কিছু প্রাইমারী ভলান্টারী একটিভিটিস শুধু রাখা হবে, যেমন তার ভাল কাজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা যা রিয়েল পৃথিবীতে পরিপক্ব মস্তিষ্ক হিসেবে কাজে লাগবে। রিয়েল জগতে আসার পরে, চারশত বছর পূর্বের যে সকল স্মৃতি সেন্ট্রাল ডাটাবেস সার্ভার কম্পিউটারে জমা করা থাকবে সেখান থেকে প্রতিটি মস্তিষ্কে তাদের পূর্বের স্মৃতিগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অথচ মাঝখানে সে একটি বিশাল সময় নিজের মধ্যে পরিভ্রমণ করবে ভ্রমণের সময় সবকিছু বাস্তব অথচ ভ্রমণ শেষে ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে বিন্দু মাত্র স্মৃতিও তার প্যারাইটাল লোবে জমা থাকবে না। এভাবে চারশত বছর পরে সে আসল মানুষরূপে ভূ- পৃষ্ঠে উঠে আসবে। আবার পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলবে ফুলে- ফলে, পশু- পাখিতে, আর মানুষে মানুষে।

দুর্যোগ ও সুযোগ:

জলদি চলে এস।

এখানে আর এক মুহূর্ত নয় আমাদের আরও নিরাপদ একটি যায়গা দরকার। সিনার পায়ে বেশ বড় একটা জখম হয়েছে, বেহুশের মত খোরা পা নিয়েই লুইসের কথা মতো দিক্বিদিক হেটে বেড়াচ্ছে।

এই নাও পায়ে এই আবরণটুকু বেধে নাও। ব্লিডিং কিছুটা বন্ধ হবে।

কষ্টে সিনার চোখ ফেটে যেতে চাইছে, আমি পারছি না লুইস, আমি আর পারছি না, তুমি চলে যাও, জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমি খুব বেশি ক্লান্ত, আমাকে ছেড়ে দাও আমি এখানেই পড়ে থাকতে চাই। আমি আর পারছি না বলে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। এই পরিস্থিতিয়ে সিনার প্রতি লুইসের কোন মমতা হয় না বরং প্রচণ্ড রাগ হয়। কিছুতেই সিনাকে এখানে রেখে যাওয়া চলবে না, মরতে হলে একসাথে মরবে।

তুমি চলে যাও। বাঁচার চেষ্টা কর।

কি বলছ যা'তা,

ধমকের সুরে লুইস সিনার বাম হাতটা নিজের কাঁধে চেপে ধরে খোরাতে খোরাতে এগিয়ে যায়। চারিদিকে ছায়া ছায়া অন্ধকার হালকা নিয়ন আলোতে রুমের মধ্যকার আসবাবগুলোকে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে, দুর থেকে লেজার এর কর্কশ আওয়াজ আর বিদ্যুৎ চমকের মত আলো আসছে।

পানি! পানি! আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

বুকটা মোচর দিয়ে ওঠে সিনার, এবার বুঝি শেষ নিশ্বাসটুকু বেড়িয়েই যাবে। আরও কিছু একটা বলার ছিল লুইসকে কিন্তু পানির তেষ্টায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। চোখে ঝাপসা দেখতে থাকে সিনা। লুইসের কথাগুলো, টেম্পো কমানো স্লো মোশনের কোন শব্দের মত শোনাতে থাকে ওর কানে, চোখের উপর হালকা আলোটুকুও ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে, মনের কোন এক কোনে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে এটাই কি মৃত্যু? যদি এটাই মৃত্যু হয় তবে বেশ, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ।

এই তো আর একটু সামনে এগুতে হবে আশে পাশে নিশ্চয় কোন রুম আছে। লেজার এর তীক্ষè আওয়াজ এখন অনেকটাই কম।

৩২৭ নম্বর রুম, ইলেকট্রনের হালকা আলোক ছটাতে এখনও নম্বরটি ঝলমল করছে। পেছনের টানেলের দিকে একবার তাকিয়ে ঘৃনাভরে একদলা থুতু ছুড়ে মারে লুইস।

সিনা, এই সিনা, আর একটু ধরে থাকো প্লিজ,

ঐ তো রুমটি দেখা যাচ্ছে।

তুমি এখানে একটু বস। আমি ভিতরের পরিস্থিতি দেখে আসি। বসিয়ে রাখতে যেয়ে লুইস লক্ষ্য করে সিনা তার শরীর ছেড়ে দিয়েছে, গলায় হাত দিয়ে শিরার দপদপানি অনুভব করার চেষ্টা করে, হ্যাঁ আছে এখনও আছে। সিনাকে

কংক্রিটের একটি ভাঙ্গা বীমের পাশে শুইয়ে রেখে সন্তর্পণে এগিয়ে যায় লুইস। কোমরে গুজে রাখা পুরনো একটি জি- ম্যাগনাম বের করে সেফটি কেসটা অন করে নেয়। দরজাটা আলতো করে সরিয়ে দ্রুত ভিতরে ঢুকে পরে। কর্কশ শব্দে দুম দুম দুম তিনটি শব্দ শোনা গেল।

বিকট শব্দে সম্বিত ফিরে পেয়ে আর্ত চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সিনা । ৩২৭ লেখা নম্বরটি কয়েকবার স্পার্ক করে বন্ধ হয়ে যায়। দরজা দিয়ে হালকা ধোঁয়া বের হতে থাকে। লুইস পা টেনে বেরিয়ে আসে। লুইসকে দেখে সিনা একটু শক্ত হয়ে বসতে চায়। চলে এস আমার কাঁধে হাত রাখ। দ্রুত দুজনেই ভিতরে ঢুকে পরে। রুমের মধ্যে কোন আলো নেই ঘন অন্ধকারে ঢাকা। লুইস গ্যাসের একটি ফিলো লাইট জেলে দেয়, ঘরময় হলুদ উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পরে। ঘামে ভেজা মুখ দুটি অসম্ভব চোখ ধাঁধানো আলোয় চকচক করে ওঠে। সেলফগুলোতে বিভিন্ন রকমের অস্ত্র গোলাবারুদ আর সারি সারি করে রাখা এ্যমুনেশন এর বক্স দেখে লুইস চমকে ওঠে।

এতো দেখছি অস্ত্রের ঘর, সর্বনাশ!

এখানে অসংখ্য ক্যামেরা লাগানো রয়েছে।

গর্দ্ধভ রোবটগুলো এখনি চলে আসবে।

আমাদের এখান থেকে বেরুতে হবে।
পাশেই একটি আন্ডার কুইক দেখতে পায় লুইস। সিনাকে পেছনে বসিয়ে দেয়। পিপাসার্ত শরীরে অচেতন পরে থাকে সিনা। অস্ত্র গুদাম থেকে সাদা রঙ্গের উপর লাল রঙ্গের প্লাস চিহ্ন অংকিত একটি ইর্মাজেন্সি বক্স আর কয়েকটি অত্যাধুনিক লেজার তুলে নেয় লুইস। আন্ডার কুইকে উঠেই নেটওয়ার্ক সিস্টেম মডিউলের ফাইবারগুলো ছিঁড়ে ফেলে দ্রুত কুইক স্টার্ট করে দেয়, ম্যাপ দেখে দেখে সকল যোগাযোগ এর পথ থেকে অন্তত ৫০ কিঃমিঃ দুর দিয়ে এগিয়ে চলে ওরা। বিকট শব্দে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে কুইক থেমে যায়। কুইকের আউট লুকিং মনিটরে লক্ষ করলে শুধু ভূ- গর্ভস্থ কাদামাটি দেখতে পায় লুইস। সামনে একটি কংক্রিট বীমের সাথে কুইক এর সংঘর্ষ হয়েছে, কুইকের ফ্রন্টাল ড্রিলটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে। লুইস ব্যাক পাপ করে কুইকটাকে আস্তে আস্তে পেছনে নিয়ে আসে। ভেঙেপড়া বিমগুলোকে ফাঁকি দিয়ে আবার সামনে এগুতে থাকে। ড্রিল বাঁকা হয়ে যাওয়ার ফলে দশ ডিগ্রি এঙ্গেলে কুইকটি চলছে। সামনে একটি জীর্ণ আশ্রয় কেন্দ্র দেখতে পায় লুইস। হিট ডিটেক্টর এর মাধ্যমে দেখে নেয় কাছে পিঠে কোন রোবট বা মানুষ আছে কিনা। বড় আকারের একটি বস্তু হিট ডিটেক্টরে ধরা পরে, বস্তুটিকে বড় ধরনের জন্তু জানোয়ারের মত দেখায়। কি হবে ওটা বুঝতে পারে না লুইস। তবুও সাহস রেখে কুইক টাকে পারকিং জোনের দিকে নিয়ে যায়। হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পরে প্লাটফর্মে, মিনিট খানেক পরেই আবার ফিরে আসে। চলো এখানে আশাকরি কোন সমস্যা নেই একটি পুরনো জেনারেটর এখনো চলছে। বহু দিনের পুরনো হওয়ায় প্রচুর তাপ বিকিরণ করছে বলে হিট ডিটেক্টরে অন্য রকম মনে হয়েছে। অচেতনের মতো পরে থাকা সিনাকে ধরে রুমটির দিকে এগিয়ে যায় লুইস। ইমার্জেন্সী বক্সটা বের করে সিনার মুখে একটু তরল ঢেলে দেয়, চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দিলে সিনা আস্তে চোখ খোলে। বক্স থেকে ব্যথা নাশক স্প্রে বের করে পায়ে আলতো স্প্রে করে দেয়। প্রচুর ক্লান্তি আর মানসিক চাপে চোখ বন্ধ হয়ে আসে সিনার। সিনাকে

একটি টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে আন্ডার কুইকে থাকা ম্যাপ এর মাধ্যমে দেখে নেয় নিজেদের বর্তমান অবস্থান। এবার এই ভূগর্ভস্থ আশ্রয় কেন্দ্রটির রুমগুলো পরীক্ষা করে দেখতে থাকে লুইস। না কোন রুমেই কোন ডিটেক্টর বা ঐ জাতিয় কিছু নেই। সিনার রুমে ফিরে এসে একটু তরল নিয়ে ধাতব বাক্সের উপর শুয়ে পরে, ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পরে।

অদ্ভুত একটি দুঃস্বপ্নে লুইসের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ইমার্জেন্সী বক্স থেকে একটু পানি পান করার পর স্বপ্নের কথা চিন্তা করে কেঁপে কেঁপে ওঠে। দুঃস্বপ্নটা এরকম যে, লুইস বাথটাবে শুয়ে আছে। বাথ টাবের উষ্ণ পানিতে ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে। অকল্পনীয় এক শারীরিক আরাম বোধ করছে লুইস। হঠাৎ মাথার মধ্যে কেমন বো বো একটি শব্দ। দ্রুত চোখ খোলে লুইস। বাথ টাব থেকে উঠতে যেয়ে দেখে তার কোন শরীর নেই আর তাই অঙ্গ নামের কোন কিছুর উপস্থিতি নেই। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু কোন শব্দ নির্গত হয় না। কাছে পিঠে কেউ নেই যে ওর বোবা চিৎকার শুনবে। ঘন চিটচিটে আঠালো পদার্থে বাথটাব ভরে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে দেখতে পায় সম্পূর্ণ বাথটাবটি একটি উলঙ্গ মস্তিষ্কে পরিণত হচ্ছে। কি বীভৎস সেই মাংসপিণ্ড। হাত পায়ের নিচ থেকে ঘন তরল আস্তে আস্তে নরম কাদার মত হতে থাকে। থ্যাক ব্যাগে আঠালো মাংসপিণ্ড হার্ট বিটের মত ধক ধক করে কাঁপছে। গলগল, ফলফল বীভৎস শব্দে হঠাৎ মাঝখান থেকে চিরে গেল সেই মাংসপিণ্ড। যেন গোটা মস্তিষ্ক টা হা করে উঠতে থাকে। অনেকটা প্রসারিত হয় সেই মুখ আর তখনি হঠাৎ লুইস তার শরীরের উপস্থিতি লক্ষ্য করে। আর সাথে সাথে প্রতিটি অঙ্গকেও। বীভৎস মাংস পিণ্ড থেকে ধীরে ধীরে হলুদ এক ধরনের পদার্থ নির্গত হতে থাকে। আস্তে আস্তে লুইস কে টেনে নেয় মাংস পিণ্ডটি। লুইস শত চেষ্টা করেও নিজেকে রুখতে পারে না। প্রচণ্ড আত্ম চিৎকার শোনা যায় ঘরময়। একসময় সমস্ত শরীরটা গিলে ফেলে পচা মাংসপিণ্ডটি।

তিন টা বিয়াল্লিশ এ.এম। মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে লুইস। শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি কিন্তু ঘুম যেন একেবারে শেষ। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘুমানোর চেষ্টা করে, কোন কাজ হয় না। ঘরের দেয়ালে সারি সারি সুইস বোর্ডের দিকে চোখ পরে লুইসের, উঠে এগিয়ে যায়। বোর্ডের উপর হাতের ইশারা করতেই ঝলমলে আলো জ্বলে ওঠে চারিদিক। জেনারেটরে যান্ত্রিক শব্দ যেন আরও একটু বেড়ে যায়। পাশে একটা গেট লক্ষ্য করে লুইস, গেটটা লক করা দেখে একটা ভারি রড দিয়ে আঘাত করতেই ওটা ভেঙ্গে গেল। জেনারেটর রুমের ঝলমলে আলো এখানে হালকা ভাবে ঢুকে পরেছে, লুইস বোর্ড খুঁজতে থাকে।

মাই গড! এতো দেখছি হেড কাটার রুম। অসংখ্য হেড কাটার সারি সারি করে রাখা রয়েছে। এখানে একসময় হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীদের মাথা কেটে ফেলা হত। পাশে আরও একটি গেট দেখে আস্তে ধাক্কা দিতেই ওটা খুলে গেল। ভিতরে হালকা গোলাপি বাতি জ্বলছে, সারি সারি করে রাখা পানীয় এর বোতল আর শুকনো খাবারের টিন। কয়েকটা ছাড়া প্রায় সব গুলোই নষ্ট হয়ে গেছে। কতোগুলো কর্ণ এর টিন আর শুকনো খাবার হিসেবে কিছু এয়ার টাইট বিস্কুটের প্যাকেট দেখতে পেল। পাশেই ফ্রেস রুম দেখে দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করে, ট্যাংক ভর্তি পানি আছে, প্রয়োজনে আরও পানি তুলতে এখানে একটি ডিপ- টিউবওয়েলও রয়েছে। পাশে আলমারিতে বেশ কিছু নতুন পোশাক পেয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ শাওয়ার নেওয়ার পর। নিজেকে অনেক হালকা মনে হয় লুইসের। একটা কাঠের টুলে বসে বোতল থেকে সামান্য তরল ঢেলে দেয় মুখে। পানীয় এর বোতল আর শুকনো খাবার এর টিন গুলো পরিষ্কার করে কিছু খাবার নিয়ে চলে আসে সিনার কাছে। ক্লান্ত শরীরে প্রচণ্ড ঘুমে আচ্ছাদিত একটি নারী দেহ। লুইস সিনার মাথায় হাত রাখে, সিনা চমকে ওঠে কি হয়েছে? কি হয়েছে ? ভয় পেওনা কিছু হয় নি।

অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে পানি। লুইস বোতল বাড়িয়ে ধরে সিনা দীর্ঘ দিনের তৃষ্ণা মেটায়। শরীরটা একটু ভাল বোধ করে সিনা।

সকাল ১১ টা বাজে, ওঠো লুইস আর কত ঘুমবে।
লুইস চোখ কচলাতে থাকে।
হাত মুখ ধুয়ে এস, নাস্তা করে নিই।
আজ ওরা টিনের খাবার নিয়ে বসেছে । অনেক দিন পরে ওরা একটু ভাল খাবার খাচ্ছে। খাবার যাই হোক এও তো পায়নি এতদিন। টানেলের ফাঁকে ফাকে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন পোকামাকড় আর নোংরা- পচা পানি পান করে কাটিয়েছে এতদিন।
অনেকদিন পরে সিনাকে একটু লক্ষ্য করে দেখল লুইস, কি- যে সুন্দর লাগছে আজ ওকে, ঠোটের কোনে মুচকি হাসি নিয়ে চপলমতি মেয়ের মত হরবর করে বলতে থাকল আমি এখানে একটি রুম পেয়েছি, আমাদের পচা খাবার খেতে হবে না, এখানে অনেক খাবার আছে আমাদের দুজনের বেশ কিছু দিন চলে যাবে। খাওয়া শেষ করে ওরা দুজন রুম গুলো পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। এখানে বড় একটা জেলখানার মত আছে, হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীদের এখানে হয়তো আটকে রাখা হতো আর সময় শেষ হলে হেড কাটার রুমে নিয়ে মাথা কেটে ফেলা হতো। কি পৈশাচিক ব্যাপার চিন্তা করেছো লুইস। নিজেদের থাকবার জন্য রুমগুলো কে পরিষ্কার করে ফেলে ওরা। অক্সিজেন ক্রিয়েটরকে দুজনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সাপ্লায়ের সফটওয়ার কমান্ড দেয়। দুজন মাত্র মানুষ, গোটা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। একে অপরকে নিবির ভাবে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চায় ওরা। পৃথিবীর সকল কুৎসিত আর নোংরামিকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে থাকতে চায় ওরা। ক্রিক ক্রিক শব্দে লুইসের ঘুম ভেঙ্গে যায় বায়ো- ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে কয়েকটি ধাতব দেহ দেখতে পেয়ে দ্রুত সিনাকে ডেকে তোলে। জেনারেটর সহ সকল প্রকার তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্র বন্ধ করে দেয়, ভু- গর্ভস্থ রুমগুলোতে এক নিঃসীম অন্ধকার নেমে আসে। ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যায়

না। চোখে হিট ডিটেক্টর লাগাল লুইস। হালকা লাইম কালারে ৩ টি দেহের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল। ছোট টাইপের আন্ডার কুইক নিয়ে এদিকেই আসছে। অন্ধকারে দেয়াল হাতরে হাতরে দ্রুত বাথ রুমে চলে যায় ওরা। বাথ টাবের ওয়াটার টেম্পারেচারকে অনেক নিচে নামিয়ে পানিকে দ্রুত ঠাণ্ডা করে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ডুবিয়ে রাখে যাতে শরীরের উত্তাপ ঐ ধাতব দেহগুলো চিহ্নিত করতে না পারে। হ্যান্ড শাওয়ারের নল ছিঁড়ে পানির উপরে ধরে পালাক্রমে জীবন দায়িনী অক্সিজেন নিতে থাকে ওরা। হিট ডিটেক্টরে দেখতে পায় তিনটি ধাতব শরীর ধীরে ধীরে ওদের একেবারে নিকটে চলে এসেছে। লুইস সিনার শরীরটা অক্টোপাসের মত জাপটে ধরে থাকে এভাবে কতক্ষণ ছিল লুইস জানে না শুধু এটুকু জানে বাঁচতে হবে। কিছুক্ষণ পরে ধাতব দেহগুলো আবার তাদের আন্ডার কুইক স্টার্ট করে চলে যায়। অনেকদূর চলে যাওয়ারও অনেক পরে শরীরের সাথে বরফ খণ্ড পেঁচিয়ে রুম গুলো পরীক্ষা করতে চলে আসে। হ্যাঁ যা সন্দেহ করেছিল তাই ওরা কিছু রেটা নেট হিট ডিটেক্টর সেট করে গেছে এর ফলে অন্তত এক হাজার মাইল দুর থেকেও এখানে কোন তাপের অস্তিত্ব আছে কিনা বুঝতে পারবে। লুইস খুব আস্তে আস্তে আন্ডার কুইকে থাকা কম্পিউটারটির কাছে যায়। নিজের তৈরি করা শিরান ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে দ্রুত কোডিং লিখে চলে। অল্প সময়ের মধ্যে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করে ফেলে লুইস। ওটাকে একটা ছোট স্লাইডে রেখে স্মল নেটওয়ার্ক করে ওদের রেখে যাওয়া রেটা নেট ডিটেক্টরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। কোন তারতম্য নেই কোথাও। মাত্র তিন ন্যানো সেকেন্ডে লুইস ওদের ডিটেকশন নেটওয়ার্কে হামলা চালায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পরে ওদের সকল ডিটেক্টর মেশিন। এখনো সিনা ভয়ে কুঁকড়ে আছে। ওকে অভয় দিয়ে কাজে লেগে পরে লুইস এখন খুব দ্রুত ওদের রেখে যাওয়া রেটা নেট ডিটেক্টরে একটি ডিকোড প্রোগ্রাম চালাতে হবে। যার ফলে এখানে কোন প্রকার তাপ নেই বলে এই মেশিনটি প্রতিনিয়ত ওদের কাছে ডাটা পাঠাতে থাকবে।

<u>উদ্ধার (লুইস ক্রিস্টাল)</u>

মহামান্য ডিমোস আপনার পুত্র লুইস ক্রিস্টালকে পাওয়া গেছে। এখান থেকে তিনশত কিলোমিটার দুরে একটি পরিত্যক্ত গুহায় সে অবস্থান করছে। সাথে একটি মেয়েও আছে নাম সিনা। ডিভি- ক্যামে দেখতে পেলাম লুইস একটি জীর্ণ ঘরের কোনে আতঙ্কিত অবস্থায় বসে আছে। সিনা নামের মেয়েটি লুইসের পেছনে আশ্রয়ের ভঙ্গিতে রয়েছে। বিকট শব্দে দরজা ভেঙ্গে গেল, ভিতরে ঢুকল একটি দানবাকৃতির রোবট, হাতে লেজার। ট্রিগারের একটি টানে মুহূর্তের মধ্যে দুটি মানব স্বত্বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ডিপিসি'র ক্রিক ক্রিক শব্দে ওর দিকে তাকাতেই আমাকে জানালো মহামান্য ডিমোস আপনি ডিভি ক্যামে যে রোবটটিকে দেখতে পাচ্ছেন এটির ইনফো বের করে ফেলেছি। এটি মিজরাল সেনারা বাহাত্তর বছর পূর্বে চতুর্থ বিশ্ব যুদ্ধের জন্য তৈরি করেছিল এটি একটি নবম প্রজাতির সি- ৩০৪ টাইপ রোবট। এটি প্রথমে একজন মানুষের ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখে সে কোন দেশের বংশোদ্ভূত। ওর প্রোগ্রামে বলা আছে কোন কোন দেশের মানুষকে মেরে ফেলতে হবে। এটি এখন লুইস ও সিনার ডিএনএ পরীক্ষা করবে, পরীক্ষার জন্য সময় নেবে ছয় সেকেন্ড আর পরীক্ষা শেষে মেরে ফেলা বা বাঁচিয়ে রাখা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেবে বারো ন্যানো সেকেন্ড। কিন্তু আমি এটিকে স্যাডো- নেট এর মাধ্যমে ওর মুল প্রসেসরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারি। আমি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলাম এখনি রোবটটিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নাও, ৩ সেকেন্ডের মাথায় দেখা গেল রোবট টি সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে পরেছে।

এই গর্ধবটা যে দেখছি থেমে গেল সিনা

হ্যাঁ তাই তো দেখছি।

সৃষ্টিকর্তাই আমাদের রক্ষা করেছেন লুইস, এ যাত্রায় আমরা বেঁচে গেলাম ।

ওহ না! ওটা যে আবার নরে উঠছে-

আমার খুব ভয় করছে লুইস ।

লুইস সন্তর্পণে একটি পুরনো পুড়ে- ক্ষয়ে যাওয়া রড হাতে তুলে নেয়।
তোমাদের কোন ভয় নেই শান্ত হও...

ভয় পেওনা লুইস। আমি তোমার বাবা ডিমোস ক্রিস্টাল, আমি তোমাদের থেকে তিনশত মাইল দুরে একটি আশ্রয় কেন্দ্রে আছি। শ্যাডো- নেট এর মাধ্যমে এই গর্দভ রোবটটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এটাকে দিয়ে আমার কথাগুলো বলাচ্ছি। ভয় পেও না।
বাবা তুমি কোথায় আমাদেরকে নিয়ে যাও। আমরা মরে যাচ্ছি আমাদের বাঁচাও।
মন দিয়ে শোন লুইস, তুমি আর সিনা দুজনে এই মুহূর্তে এই রোবটটির সঙ্গে সঙ্গে চলে আসো, রোবটটির মেমোরিতে আমার কাছে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাপ দিয়ে দিয়েছি। ও তোমাকে আমার কাছে আসতে সাহায্য করবে। আর শোন এই ঘর থেকে বেরিয়ে এনালগ ঘড়ি সময় ১৭.০০ বরাবর সোজা ষাট গজ দুরে একটি আন্ডার কুইক দেখতে পাবে, দ্রুত কুইকে ওঠ আমি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেব। তবে খুব সাবধান! সিট বেল্ট বেধে নিও মিজরাল সেনাদের তৈরি রোবটগুলো আর বিভিন্ন চোরা গুপ্ত মাইন আছে। ভয় পেও না, দেখছি কি করা যায়।

ডিপিসিকে সি- ৩০৪ রোবট আর আন্ডার কুইক এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে বলে আমি আমার প্রজেক্টের ধারণ ক্ষমতা মত একের পর এক মানুষ খুঁজতে শুরু করলাম। এখানে প্রথমত আমার দরকার সত্যিকার অর্থে সভ্য, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ এক হাজার মানুষ। তাই সি- ৩০৪ কে দিয়ে অনবরত আমি বিভিন্ন মানুষের ডি.এন.এ পরীক্ষা করে যাবতীয় তথ্য নিয়ে আসল মানুষগুলোকে খুঁজে বের করতে লাগলাম। এর মধ্যে আছে বিজ্ঞানী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, রাজনীতিবিদ, সমাজ সেবক, বুদ্ধিজীবী এছাড়া মামুলি সাধারণ মস্তিষ্কের কিছু মানুষ। প্রথমে এই মানুষগুলো সি- ৩০৪ কে দেখলেই ভয় পেয়ে যেত, আর তখনি আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করে

আমার প্রজেক্টের কথা বলতাম। এভাবে তিন হাজার মানুষকে আমার প্রজেক্টের কথা বলেছি। এদের মধ্য থেকে মাত্র সাত শত বাইশ জন পেয়েছি যারা এই প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত হতে রাজী হয়েছে। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যেন সর্বসাকুল্যে এক হাজার মানুষকে নিয়ে নিতে পারি।

আমার ছেলে লুইস এসেছে, সাথে সেই কিশোরী মেয়েটিও। আজ অনেক দিন পরে আমার মনে হচ্ছে যে আমি একজন মানুষ, আমার পরিবার আছে, আমরা এই সুন্দর পৃথিবীর বাসিন্দা, সাপের গর্তে থেকেও এক অনাবিল প্রশান্তি ছুঁয়ে গেল আমাকে। লুইসের বয়স এখন চব্বিশ। লুইস মেধাবী ছাত্র ছিল, ক্যামব্রিজ এ পদার্থ বিদ্যায় অধ্যয়ন করার শেষ দিকে যুদ্ধটা বেঁধে যায়। আমি ওকে আমার উদ্ভাবিত বিষয়টি সম্পর্কে সব খুলে বললাম ও মেধাবী ছেলে তাই চট করে সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝে গেল। কিন্তু একটি বিষয়ে ও দ্বিমত পোষণ করল, প্রতিটি মানুষ যখন ওইরূপ একটি ভার্চুয়াল জগতে অবস্থান করবে তখন তার অনেক দুঃখ কষ্ট আর আনন্দের স্মৃতি থাকবে সেগুলি কেন পরবর্তীতে এই সত্যিকার জগতে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। আমি বললাম এটি স্বপ্নের মত একটি স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পদ্ধতিতে একজন মানুষ কম করে হলেও ঐ ভার্চুয়াল জগতে পাঁচ বার জন্ম নেবে এবং প্রতিবারই মৃত্যু বরন করবে। যদি তাকে এই ভার্চুয়াল জগতের বহুবার জন্ম আর মৃত্যুর সকল স্মৃতি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে জীবনকে আর জীবন্ত বলে মনে করবে না। জীবনটাকে তখন অর্থহীন বলে মনে করবে কারণ সাধারণ ভাবে স্বপ্নের স্মৃতিগুলো থাকে খুবই দুর্বল স্মৃতি কিন্তু আমাদের ভার্চুয়াল জগতের স্মৃতি বাস্তবের মতই ধারালো। এতে আমাদের মিশনটি সম্পন্ন হবে না, জেগে উঠে সে আত্মহত্যা করবে, নতুবা স্থবির হয়ে কোথাও বসে থাকবে। এই পৃথিবীকে সে কোন ভাবেই পুনরায় সাজিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবীতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবে না। আর বর্তমানের স্মৃতি যদি তাকে ঐ ভার্চুয়াল জগতে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে দুইটি সত্ত্বা স্থায়ী হওয়ার ফলে প্রোগ্রামে কনফ্লিক্ট করে বাগের

সৃষ্টি করবে ফলে বিভিন্ন বিপত্তির সৃষ্টি হবে। দীর্ঘ সময় দুজনেই নীরব।

এই আশ্রয় কেন্দ্রটিতে একটি রাজকীয় ডাইনিং স্পেস আছে।
ওরা আজ একসাথে রাতের ডিনারে বসেছে।
সিনা তোমার কথা বল।
তুমি কোথায় বড় হয়েছ।
তোমার বাবা, মা কোথায়।
আমি জানিনা, বলেই মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।
ওর মা বেঁচে নেই।
নাম রিগ্যান ডিলো, ক্যামব্রিজের বায়োকেমিক্যাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
যতদূর শুনেছি উনি এখন মিজরালের গোপন একটি বাঙ্কারে আটক আছেন। ওনাকে দিয়ে মিজরাল সেনার একটি দল বায়োকেমিক্যাল চেইন রিফ্লেক্ট নিয়ে কাজ করাচ্ছে। ওটার মাধ্যমে নাকি ভূ- গর্ভে অবশিষ্ট যে প্রাণগুলো আছে মুহূর্তের মধ্যে মারা পরবে।
খুবই খারাপ খবর লুইস।
এভাবে চলতে থাকলে তো কিছু দিনের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব থেকে সকল মানুষ এবং তার সাথে থাকা সকল প্রাণের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
আমাদের আরও দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে।
আমার একটি বিষয়ে খুব ভয় করছে বাবা।
কি বিষয়।
আমারা যখন দীর্ঘ সময়ের জন্য ঐ ভার্চুয়াল জগতে বসবাস করব তখন কোন ভাবে যদি ঐ রক্ত পিপাসীর দল এই আশ্রয় কেন্দ্রটির খবর জেনে যায় !
দীর্ঘ ঘুমে হাইপার টাইম টিউবে থাকা ঘুমন্ত মানুষ গুলোতো নির্বিচারে ওদের শিকারে পরিণত হবে।
সেটাও আমি ভেবে দেখেছি লুইস।

আমাদের এই আশ্রয় কেন্দ্রে একটি বিশাল কক্ষ আছে যেটাকে কেউ কোন ভাবেই খুঁজে পাবে না। ঐ কক্ষটিতে ঢোকার জন্য ডিপিসি'র সাহায্য ছাড়া ঢোকা সম্ভব না।
সবচেয়ে বড় কথা হল এই যায়গাটির ম্যাপ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা দলের কাছেও কখনও ছিল না, এটি সম্পূর্ণ সিকিউরড একটি এরিয়া।
তারপরেও আমরা প্রটেকশনের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেব।
লুইস এসো আমরা যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখি এগুলো সঠিক ভাবে কাজ করে কিনা ?
ওরা বায়ো ইলকট্রো ফ্ল্যাশ এর দিকে তাকিয়ে থাকে এখানে ডিপিসি সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম টি ডিবাগ করে দেখাতে থাকে।
অসংখ্য দুর্বোধ্য গাণিতিক অংক কষে চলে ডিপিসি।
বিভিন্ন ভিজুয়াল এবং অডিও সেটিংস দেখা গেল।
দেখো লুইস আমরা এই নিখুঁত অডিও এবং ভিজুয়ালের জালে প্রতিটি মানুষকে ত্রি- মাত্রিক ইফেক্টের অবয়বে ডুবিয়ে রাখব।
এখানে দেখ অসংখ্য ক্রিস্টাল ডিস্ক দেখতে পাচ্ছ, এখানে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য নির্ধারিত ভার্চুয়াল জগতের জন্য একটি ভেরিয়েবল প্রোগ্রাম সেট করা আছে এখান থেকে কোটি কোটি স্বত্বার সৃষ্টি হবে কিন্তু এরা সবাই নকল।
এখানকার প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আলাদা আলাদা প্রসেসর থাকবে এবং এক একটি দিক এক একটি প্রসেসর নিয়ন্ত্রণ করবে তবে মুল প্রসেসর হিসেবে ডিপিসি সকল প্রসেসরের সাথে একটি নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করবে যাতে সকল স্বত্বার দিকে ডিপিসি নিজে সবসময় খেয়াল রাখতে পারে।
এই ফাইবারের পাশে যে স্লাইডগুলো দেখছ এগুলো অত্যাধুনিক ভিগা র‍্যাম। এর মধ্যে সকল ভার্চুয়াল মেমোরিগুলো রিড এবং রাইট হবে এবং প্রক্রিয়া হওয়া তথ্যগুলো আবার কেন্দ্রীয় সেকেন্ডারি মেমোরি ইউনিটে জমা রাখা হবে। ভার্চুয়াল জগতে একজন মানুষ যতক্ষণ না মারা যাবে ততোক্ষণ এই মেমোরি রিড এবং রাইট দুটো

কাজই করবে। যখন সে ভার্চুয়াল জগতে মারা যাবে তখন তার পূর্বের সকল মেমোরি রিসেট হয়ে আবার নতুন করে ডাটাবেসে ষ্টোর হবে এভাবেই লুপিং পদ্ধতিতে প্রতিটি অস্তিত্ব আগামী চারশত বছর অতিক্রম করবে।

লুইস চমৎকৃত হয়ে বলল এটা তো আসলেই চমৎকার। এই কাজটি সম্পন্ন হলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষ আমাদেরকে আজীবন স্মরণ করবে।

কিন্তু এখানে একটা সমস্যা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

চারশত বছর যখন শেষ হবে তখন তো প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ভাবে ঐ ভার্চুয়াল জগতে কোন না কোন বয়স অতিক্রম করবে তখন যদি আমরা হঠাৎ তাকে এই প্রোগ্রাম থেকে বের করে আনার চেষ্টা করি তাহলে তার মস্তিষ্কের নিউরন সেলে বিষম প্রভাবের সৃষ্টি হবে এতে বেশ কিছু অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ডেসট্রয় হয়ে যেতে পারে বা তৎক্ষণাৎ টার্মিনেট হয়ে বেশ কিছু অস্তিত্বের সমাপ্তি করতে পারে।

তুমি বুদ্ধিমান ছেলে তাই এই প্রজেক্টের সবচেয়ে নাজুক জায়গাটা তোমার চোখে ঠিকই ধরা পরে গেছে।

এ বিষয়টি সম্পর্কে আমিও চিন্তা করেছি এক্ষেত্রে আমরা টাইম ওয়ার্প পদ্ধতি ব্যবহার করব।

টাইমকে ওয়ার্প করে আমরা সময়কে যে কোন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাই এক্ষেত্রে আমরা সময়টাকে খুব দ্রুত অথবা ধীরে চালাতে পারব তার জন্য রয়েছে ডিপিসি ।

ডিপিসি প্রত্যেকটি মানব শরীরের মস্তিষ্ক এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থা খুব নিখুঁত ভাবে নিরূপণ করবে এবং চারশত বছর অতিক্রমের সময় কে কোন অবস্থাতে আছে সেটি নির্ণয় করে তাদের প্রত্যেককে আবার আলাদা আলাদা ভাবে তাদের টাইম ওয়ার্পকে কতটুকু গতিময় বা ধীরে পরিচালিত করলে তারা ঠিক একই সময়ে জেগে উঠবে সেটি নির্ণয় করবে।

লুইস প্রত্যেকটি যন্ত্র দেখতে থাকে, এটা কি?

এটা হচ্ছে স্যফিক্সন নেটওয়ার্ক এটা প্রত্যেকটি অস্তিত্বের সাথে প্যারালাল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের কেন্দ্রীয় নিউরনে সঠিক আবেশের কম্পাংক সৃষ্টি করবে যার ফলে এই এক হাজার মানব মস্তিষ্কে আজ অবধি যে পরিমাণ তথ্য জমা হয়েছে তাকে মাল্টিপ্লেক্স করে কয়েক কোটি অস্তিত্বের জন্ম দেবে এবং এই ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বগুলোর মধ্যে তারা তাদের ভার্চুয়াল জগত অতিবাহিত করবে ফলে তারা এ যাবত কাল যা দেখেছে যা শুনেছে এবং যে সকল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়েছে তার প্রতিফলনই ঘটতে থাকবে ফলে তারা কেউই বুঝতে পারবে না যে তারা একটি অলিক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই প্রজেক্টে সকল প্রকার মানুষ রাখব এখানে একটি নবজাত শিশু থেকে শুরু করে একেবারে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষ থাকবে। ডিপিসি এই সকল মানুষের মস্তিষ্ক কে স্ক্যান করে তাদের এই স্বত্বাগুলোকে মাল্টিপ্লেক্স করবে যাতে করে ঐ স্বত্বাগুলো ভার্চুয়াল জগতে থাকা কালীন সময়ে কোন কিছু সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা না করতে পারে। এটা লিটামুরিয়াম ৪৯৬-পি। এটি একটি ভিন্ন ধর্মী প্রসেসর। এটা গত সত্তর বছর পূর্বে তৈরি করা হয়েছিল। আমরা জানি আজ থেকে প্রায় একশত পঁচাত্তর বছর পূর্বে ২০০০ সালের গোঁড়ার দিকে পৃথিবীতে মাল্টি টাস্কিং এর জন্য মাল্টি প্রসেসর তৈরি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় কিছু গাণিতিক কাজে মাল্টি- টাস্কিং প্রসেসর ব্যবহারের ফলে গাণিতিক সমাধান ভ্যারিয়েবল ভাবে বের হয়। যার ফলাফল ঠিকই থাকে, কিন্তু সমীকরণটির সমাধানে পৌঁছানোর মাঝ পথে কিছু বিভেদ থেকে যায় বলে নির্দিষ্ট কাজে কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে, তাই এরূপ সমীকরণের ক্ষেত্রে যাতে প্রসেসর কোন প্রকার মাল্টিটাস্কিং না করে এবং আগা গোঁড়া একই ভাবে কনষ্ট্যান্ট মান বের করতে পারে সেলক্ষ্যে এই প্রসেসরটি তৈরি করা হয়েছিল। আমরা এখানে এই প্রসেসরটি ব্যবহার করব যাতে আমাদের প্রজেক্টে যে সকল মানুষ দীর্ঘ সময় ভার্চুয়াল জগতে পরিভ্রমণ করবে তারা কিছু কিছু কাজ যাতে না করতে পারে বা নির্দিষ্ট কিছু কাজ তাদের সবারই করতে হয়

এই ব্যাপারে এটি কাজ করবে। এক কথায় এটি একটি দু¯প্রাপ্য প্রসেসর এটি বাইরের বাজারে পাওয়া যেত না। আমরা এই বৈজ্ঞানিক আশ্রয়কেন্দ্রে আছি বলেই এটি আমাদের হাতের নাগালে এসে গেছে। এর সুবাদে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গবেষণা কাজটি আজ সফল হতে চলেছে।

উদ্ধার (রিগ্যান ডিলো)

দুর্বল দেহের কিছু মানুষ ধীর গতিতে মাঝারি আকারের ড্রাম ঘারে নিয়ে একটি বড় চৌবাচ্চার কাছে রাখছে। বড় গোফওয়ালা দুই জন লোক, হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। একজন সম্ভবত লিভা টেনেছে, নেশায় চুর হয়ে মাথাটা নিচু করে চেয়ারে বসে আছে। দেখলে মনে হবে পায়ের সামনে একদলা হীরা, চকচকে চোখে তাকিয়ে আছে। অপর জন বোধ করি একটু বেশি খিচড়ে মেজাজের, কারণ ছাড়াই দাঁতে দাঁত চেপে বকাবকি করেছে।

সব কয়টা গাধার বাচ্চা।

এই তোদের নিজের কোন মাথা বুদ্ধি নাই না কি?

তোদের চেয়ে এফ ৭২ রোবটগুলোও অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে।

একদল বন্দি মানুষ অমানুষিক শ্রম দিয়ে কাজ করে চলেছে। নিয়মিত অবহেলায় মানুষগুলো সত্যিকার অর্থেই নিম্নমানের রোবটের মত কাজ করছে। এই আশ্রয় কেন্দ্রটি মিজরালের তৈরি। মিজরালের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্রেটসিতানা আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের সার্ফেস থেকে আরও ছয়শ ফুট নিচে বিশাল আয়তনের এই আশ্রয় কেন্দ্রটি গোপন অস্ত্র তৈরির কাজে নির্মাণ করেছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ বিশ্ব যুদ্ধে শুধু ভূ- গর্ভে থেকেই ৪২ টি পারমানবিক হামলা হয়, যার ফলাফল হিসেবে সমগ্র মহাসাগরের পানি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে টগবগ করে ফুটতে থাকে। ভূমি স্ফীতি হওয়ার ফলে কিছু কিছু আশ্রয় কেন্দ্র সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে পরে। আটলান্টিকের তলদেশে মিজরাল বাঙ্কার নামে পরিচিত এই আশ্রয় কেন্দ্রটিরও বেশ ক্ষতি হয়। দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে কিছু কক্ষকে রেসকিউ করা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ কক্ষগুলোই ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়। বর্তমানে যে সকল কক্ষ গুলো আছে সেগুলোও মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বিম ভেঙ্গে প্রবেশ করতে পারে প্রচণ্ড উত্তপ্ত বিষাক্ত পানি। কিছু কিছু যায়গায় বিম লিক করে উত্তপ্ত পানি প্রবেশ করছে, বিষাক্ত পানি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য এখানে মানুষ শ্রমিকদের ব্যবহার না করে

কিছু রোবট দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। মানুষের গায়ে ঐ তেজস্ক্রিয় বিষাক্ত পানি লাগলে মুরাচির মত ভয়াবহ রোগ হতে পারে। তাছাড়া জেনেটিক কোডিং পরিবর্তিত হয়ে যে কোন মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে প্যারালাইজড হয়ে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। বড় বড় চৌবাচ্চা তৈরি করে বায়ো- কেমিক্যাল চেইন রিফ্লেক্ট তৈরির কাজ চলছে। ক্যামব্রিজের বায়ো- কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রিগ্যান ডিলোকে এই কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আসলে দায়িত্ব না, তাকে এই কাজ করাতে বাধ্য করা হয়েছে। রিগ্যান ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনটি অত্যাধুনিক রোবট সব সময় তার সাথে সাথে রয়েছে। তাদের কাজ তারা রিগ্যানকে গার্ডে রাখবে আর তার কর্ম পদ্ধতি শিখে নেবে। যাতে পরবর্তীতে এই কাজে সরাসরি রোবটকে কাজে লাগানো যায়। চেইন রিফ্লেক্ট তৈরির কাজ সত্তর শতাংশ শেষ হয়েছে আর বাকি ত্রিশ শতাংশ শেষ করতে সময় লাগবে প্রায় ছয় দিন। এর পর প্রোগ্রাম ডি- বাগ করে ভূ- গর্ভে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা অবশিষ্ট মানুষ এবং সকল ধরনের প্রাণ সনাক্ত করে হামলা চালানো হবে। এই চেইন রিফ্লেক্ট এক ধরনের জৈবিক কোষ এর উপর করা হয় ফলে কোষগুলো চক্র বৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। এই কোষগুলো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রথমে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজতে থাকবে, প্রথমে মানুষ এবং পরবর্তীতে সকল প্রকার প্রাণকে ধ্বংস করে দেবে। কোষগুলো মানুষের যে কোন অঙ্গের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারবে। মানব শরীরে প্রবেশ করার মাত্র ৪০ মিনিটের মধ্যে মানুষকে হাজার হাজার বিষাক্ত পোকায় রূপান্তরিত করবে। আর ঐ তৈরি হওয়া পোকাগুলো অন্য কোন মানব দেহ খুঁজতে থাকবে। এক কথায় ভয়াবহ একটা ব্যাপার! রিগ্যান চেইন রিফ্লেক্ট প্রজেক্টের নব আবিষ্কৃত কোষ গুলোর ডি.এন.এ কোডিং এর মধ্যে একটি গোপন তথ্য ঢোকানোর চেষ্টা করছে। যদি এই তথ্য কোন ভাবে সে ঢোকাতে পারে তাহলে এই জৈবিক কীট গুলো নির্দিষ্ট কিছু মানুষের ডি.এন.এ টেস্ট করে তারপর হামলা করবে। কোষগুলো যদি মিজরালের মানুষের ডিএনএ ম্যাচিং করতে পারে

তাহলেই কেবল কাজ করবে নতুবা নয়। সব মানুষ মারা শেষ হলে এই চেইন রিফ্লেক্ট যাতে অন্য কোন মানব শরীর কে কোন ভাবে ক্ষতি করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করছে রিগ্যান। এই কাজটি সম্পন্ন করতে সে খুব গোপন ভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছে। কোন কাগজ কলম বা কম্পিউটারে এই বিষয় সম্পর্কে কোন গবেষণা করলে সে ধরা পরে যেতে পারে বলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি সে তার মাথার মধ্যে রেখেছে।

আর মাত্র ২ দিন বাকি কিন্তু এখনও রিগ্যানের গোপন প্রজেক্ট পরিপূর্ণ হয় নি। রিগ্যান ইহুদি দলপতি সারাক কে বলে দিয়েছে আরও ৫ দিন সময় লাগবে। কথাটা শুনে সারাক প্রথমে ক্ষেপে উঠলেও পরে রিগ্যানকে সময় বাড়িয়ে দিয়েছে। রিগ্যান কে সবসময় আনমনা বসে থাকতে দেখে জি- ৪৫ রোবট জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি হয়েছে রিগ্যান তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোন বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন আছো, রিগ্যান,টেকনিক্যালি উত্তর দেয় আমি চেইন রিফ্লেক্ট নিয়ে চিন্তা করছি। রোবট গুলো এতো বেশি বুদ্ধিমান যে, রিগ্যানের ভয় করে মনের কথাগুলো এই লোহা লক্কড়গুলো বুঝে না ফেলে।
আর মাত্র ১ দিন বাকী রিগ্যান তার প্রজেক্ট অত্যন্ত গোপন ভাবে বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হল এই রিফ্লেক্ট এর রেঞ্জ বেশি দুর পর্যন্ত হবে না। রিগ্যান চেষ্টা করছিল কিভাবে সমগ্র বিশ্ব থেকে মিজরাল সম্প্রদায় ধ্বংস করা যায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য প্রজেক্ট অতদুর এগোয়নি। যা হোক তবুও চার হাজার কিলোমিটার এর মধ্যে কোন মিজরাল জাতীই এই চেইন রিফ্লেক্ট থেকে বাঁচবে না। ৪০ মিনিটের মধ্যে সকল দেহ গুলো বিষাক্ত পোকায় পরিণত হবে আর তার মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে এই সকল পোকাগুলো তারা তাদের নিজের দেহকে খেয়ে ফেলবে এবং এই প্রজেক্টকে টার্মিনেট করবে যাতে ভবিষ্যতে এই রিফ্লেক্ট কোন ভাবেই আর কখনো জেগে উঠতে না পারে।

ল্যাবরেটরির বড় ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে দশটা বারো পি.এম.। বারো টার সময় অর্থাৎ জিরো আউয়ারের সময় ইহুদী দলপতি সারাক চাবি দিয়ে এই প্রজেক্টের কোষ গুলোকে উন্মুক্ত করবে। আমার হিসেবে মতে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে সকল মিজরালরা মারা পরবে আর বাকী চল্লিশ মিনিট সময়ে কোষ গুলো বড় বড় পোকায় পরিণত হবে। এই সময়ের মধ্যে তাকে পালাতে হবে। রিগ্যান ডুয়েল ট্যাংক জ্বালানী এর একটি আন্ডার কুইক খুঁজতে থাকে।

আপনি কি কিছু খুঁজছেন ?
আমি সারাক কে খুঁজছিলাম।
আপনার সাহস তো কম না।
সম্মান ছাড়াই আপনি মহামান্য সারাক এর নাম উচ্চারণ করলেন।
আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি।
আমি ওনাকে প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাইছিলাম।
কুকুরের গলায় যেমন বেল্ট পড়ানো থাকে ঠিক তেমনি জি- ৪৫ এর গলার বেল্ট থেকে ছোট আকারের লিড থেকে আলো জ্বলে উঠল। আবার নিভে গেল।
আমি এই মাত্র মহামান্য সারাক এর সাথে যোগাযোগ করলাম তিনি ল্যাবেই আছেন। আপনি ওনাকে ওখানেই পাবেন।
ধীর পায়ে রিগ্যান ল্যাব এর দিকে এগিয়ে যায়।
কি ব্যাপার আমি তোমাকে খুঁজছি? কোথায় ছিলে?
জি মহামান্য আমি আপনাকে ল্যাবে না পেয়ে খুঁজতে গিয়েছিলাম।
সকাল থেকেই ম্যানুয়াল যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি নি।
প্রোগ্রাম টা আবার চালাও দেখি কোন ভুল থেকে গেল কিনা।
রিগ্যান আসল প্রোগ্রাম না চালিয়ে পূর্বে তৈরিকৃত একটা ভুয়া এনিমেশন প্রোগ্রাম চালিয়ে দেয়। নিখুঁত এনিমেশনের বিভ্রমে পরে পুরো টোপটাই গিলে ফেলে সারাক, এখন দৌর দিলেই গলায় বড়শি গেঁথে যাবে।

রিগ্যান চাপা উত্তেজনায় কুল কুল করে ঘামতে থাকে।
কি ব্যাপার তুমি কি কোন কারণে নার্ভাস ?
রিগ্যান তার কথাগুলোকে বিশ্বাস যোগ্য করতে বলে জি স্যার আমি একটি বিষয়ে নার্ভাস ফিল করছি।
এই প্রোজেক্ট শেষ হলে আমাকে কি মেরে ফেলা হবে না বাঁচিয়ে রাখা হবে?
আমি তোমার হয়ে প্রেসিডেন্ট এর সাথে কথা বলব।
তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে রিগ্যান। চিন্তা করোনা।
বারো টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, সাইরেন বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, কর্কশ শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাবার জোগাড়, প্রতিটি কক্ষে গাড় হলুদ আলো এ্যাম্বুলেন্স এর বাতির মত জ্বলছে আর নিভছে। সকল ইহুদীরা আর রোবটরা আলাদা আলাদা সিঙ্গেল লাইনে দাড়িয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে তিনি তার আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বিষয়টি লাইভ দেখছেন।

রিগ্যান, তার পরবর্তী পরিকল্পনা গুলো একবার ঝালিয়ে নেয়।
প্রথমেই তাকে কন্ট্রোল প্যানেলে যেয়ে সকল সিকিউরিটি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে হবে। এবং সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র নিয়ে সরে পরতে হবে। এই প্রজেক্টের কোন প্রকার কাগজপত্র এখানে অবশিষ্ট থাকা চলবে না। যদি কোন কারণে কোন মিজরাল বেঁচে থাকে তাহলে ওরা আবার এটাকে রি- একটিভ করতে পারে। এ্যামুনেশন রুমে যেয়ে কয়েকটি ডেটোনেটর সেট করে নির্দিষ্ট টাইম দিয়ে ডুয়েল ট্যাংক জ্বালানীর একটি কুইক নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পরতে হবে।

কাউন ডাউন শুরু হয়ে গেছে ৩৯.৩৮.৩৭....০ বলতেই সারাক কোষ উন্মুক্ত করন প্রোগ্রামের কি- টা ঘুরিয়ে দেয়। হালকা লেমন রং এর সামান্য গ্যাস টিউব থেকে বেড়িয়ে পরে। সবাই এক মনে বিষয়টি লক্ষ্য করছে কোন সারা শব্দ নেই কোথাও। রিগ্যান প্রচণ্ড ঘামছে। ১

মিনিট পার হয়ে গেল কোথাও কোন তারতম্য লক্ষ্য করা গেল না। ল্যাবের সবাই প্রচণ্ড করতালি দিয়ে এই হামলাকে স্বাগত জানালো।
৪ মিনিট পার হয়ে গেছে কোন পরিবর্তন নেই। সকল সাইরেন আর ইর্মাজেন্সি বাতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে সবাই যার যার কক্ষে বিশ্রাম নিতে চলে গেছে। শুধু রোবট গুলো নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। সারাক বিভিন্ন জায়গার খবর নিতে কমিউনিকেশন মডিউলের সামনে বসে আছে। রিগ্যান ল্যাবে আনমনা বসে প্রোগ্রামে কি ভুল করেছিল তা বের করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সারাক তার চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় আর্ত- চিৎকার করে ওঠেই মেঝেতে পরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো ৩ টি রক্ষী রোবট।
কি হয়েছে ?
স্যার, কি সমস্যা ?
কোথাও কি ব্যথা পেয়েছেন ?
স্যার কি বেঁচে আছেন ?
গর্দভ রোবটগুলোর মেমোরিতে এই পরিস্থিতিতে বলার যতগুলো কথা আছে একবারে সব বলে ফেলল।
রিগ্যান নরম পায়ে সারাক এর দিকে এগিয়ে গেল। শরীরের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেছে। ত্বক দ্রুত নীল বর্ণ ধারণ করছে দেখে রিগ্যান এর বুঝতে বাকী রইল না যে, কাজ শুরু হয়ে গেছে। দৌরে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে চলে আসে রিগ্যান। রোবটরা ইতিমধ্যেই সাইরেন বাজিয়ে দিয়েছে, ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে রিগ্যান দেখতে পায় কতগুলো প্রহরী রোবট ল্যাবের দিকে এগিয়ে আসছে। রিগ্যান দ্রুত কমান্ড পরিবর্তন করে চলে। রোবটগুলো কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে এসে সরাসরি রিগ্যানের দিকে লেজার বিম তাক করে ধরে, রোবটগুলো এই মুহূর্তে তাদের করনীয় সম্পর্কে তাদের ডাটাবেসে কোন তথ্য আছে কিনা যাচাই করছে। রিগ্যান দ্রুত প্রোগ্রামে রদ বদল করে চলে। রোবটগুলো লেজার বিমের পাওয়ার অন করে দিয়েছে দু এক সেকেন্ডের মধ্যেই ফায়ার করবে। ঠিক সেই মুহূর্তে

রোবটগুলো অস্ত্র নামিয়ে পাথরের মত নিশ্চুপ হয়ে যায়। নেটওয়ার্ক সিস্টেম মডিউলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র ফায়ার প্লেসে ফেলে দ্রুত এ্যামো রুমে ঢুকে কতগুলো ডেটোনেটর নিয়ে বিভিন্ন স্থানে সেগুলো সেট করতে থাকে রিগ্যান। সারি সারি লাশ এলোমেলো ভাবে পরে আছে। কেউ কথা বলতে বলতে মারা পরেছে, কেউ মারা পরেছে কাজ করতে করতে, মনে হচ্ছে প্রতিটি দেহ এখনও যেন বেঁচে আছে। রিগ্যান এর ভয় হয়, হঠাৎ যদি কেউ পেছন থেকে তাকে হামলা করে তার করার কিছুই থাকবে না। ইতিমধ্যে লাশ গুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকায় রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। পোকাগুলো ক্ষুদ্র থেকে ক্রমাগত বড় হয়ে ম্যাচিউরড হতে শুরু করেছে। রিগ্যান দ্রুত কুইক খুঁজতে থাকে। কোথাও কোন কুইক নেই, সামনে অন্ধকার, রোবটগুলো বিকল হয়ে পরে থাকায় বিভিন্ন ফাটল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত বিষাক্ত পানি প্রবেশ করছে। কয়েকটি কক্ষে বিষাক্ত পানিতে সয়লাব হয়ে গেছে। সামনের রুমে একটি কুইক দেখতে পায় রিগ্যান, কিন্তু ওখানে উত্তপ্ত বিষাক্ত পানি ক্রমাগত বাড়ছে। রিগ্যান বড় বড় দুইটি জ্বালানীর খালি ড্রাম নিয়ে আসে ড্রামের উপর দিয়ে লাফিয়ে রুমে প্রবেশ করে কুইকে ঢুকে ব্যাক পাপ করে কুইকটাকে পেছনের ঘরে নিয়ে আসে। ডেটোনেটরগুলোর টাইম সেটিংস এ পাঁচ মিনিটের সময় দিয়ে দ্রুত কুইক নিয়ে ইহুদি ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে পরে। আর দুই মিনিট কিন্তু রিগ্যান এখনও বেশি দুরে যেতে পারে নি। দ্রুত এগিয়ে চলে রিগ্যান ৪,৩,২,১ ব্লাষ্ট লেখা দেখতে পায় ডেটোনেটর ইনডিকেটরে। কোন সারা শব্দ নেই কোথাও। রিগ্যানের সন্দেহ হয়, ডেটোনেটরগুলো ব্লাস্ট করেছে তো ? পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ড পরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লক্ষ্য করে রিগ্যান। তিন চার বার কুইকটি উল্টে যায় প্রচণ্ড আঘাতে জ্ঞান হারায় রিগ্যান।
এখন কেমন বোধ করছেন।
সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধরমর করে উঠে বসে ।
ভয়ের কিছু নেই, আপনি আমাদের কাছে নিরাপদে আছেন।

বিশ্রাম করুন পরে সব শুনব।
লোকটির কথার মধ্যেই যেন আশ্রয় খুঁজে পায় রিগ্যান। চোখ বন্ধ করে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পরে।
শেষ অবস্থা থেকে আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি। আর পাঁচ- সাত মিনিট পার হলে আপনাকে হয়তো আর বাঁচানো যেত না।
ডিপিসি যখন জানালো যে একটি ভাঙ্গা কুইকে আহত অবস্থায় আপনি আমাদের আশ্রয় কেন্দ্র থেকে অন্তত ১২০০ কিঃ মিঃ দুরে রয়েছেন তখন আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করাটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমার ছেলে লুইস, দ্রুত একটি ফ্লেয়ার কুইক নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। আপনাকে উদ্ধার করে যখন আমাদের আশ্রয় কেন্দ্রে আনা হয় তখন আপনার রক্ত সঞ্চালন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। দ্রুত ইর্মাজেন্সিতে নিয়ে আপনাকে রেসকিউ করা হয়। আপনার মেয়ে সিনা আমাদের সাথে আছে, সিনা হেটে আসছে দেখে রিগান উঠে বসতে চায়, চোখে জল টলমল করছে, বুকের মধ্যে হু হু করতে থাকে রিগ্যানের, মেয়েকে জরিয়ে ধরে বাচ্চাদের মত কেঁদে ওঠে রিগ্যান। আমি পারিনি মা, আমাকে ক্ষমা করে দে, তোর জন্য এই সুন্দর পৃথিবীতে তোকে দেওয়ার মত আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাকে ক্ষমা করে দে। এভাবে বল না বাবা, তোমাকে আবার ফিরে পেয়েছি এটাই আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া। রিগ্যান মেয়েকে বুকের মধ্যে শক্ত করে জরিয়ে রাখে। ডিমোস চোখের জল লুকিয়ে নিজের কক্ষে চলে আসে।

<u>জরুরী কথা:</u>

আজ ১২ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রজেক্টের প্রয়োজনে দরকার মতো এক হাজার মানুষ পাওয়া গেছে। এখন তাদেরকে প্রজেক্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কাজে সহায়তা করছে প্রশিক্ষক রোবট। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত টিউব পরীক্ষার কাজ চলছে। মি-ক্যাল নামের একটি যন্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যেকের মেধা যাচাই করা

হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর যোগ্য নির্ণয় করে নির্দিষ্ট পদে পদায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে লুইস মেধা ও অন্যান্য বিষয়ে সকলের শীর্ষে আছে বলে তাকে এই মিশনের দলপতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া সহকারী দলপতি হয়েছে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ মানফি ফেদেরার। ফেদেরার অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্য ধারণে, কাজে কর্মে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত চৌকশ। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের উপর কয়েকটি দল গঠন করা হয়েছে এবং সেখানে উপযুক্ত পদে বিভিন্ন জনকে পদস্থ করা হয়েছে যাতে চার শত বছরের ভ্রমণ শেষে তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থেকে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারে। এই বিশাল সময়ের ভার্চুয়াল ভ্রমণে লুইস ও ফেদেরার সহ মোট পাঁচ জন প্রথমে অন্য সবাইকে হাইপার টাইম টিউবে রেখে তাদেরকে ভার্চুয়াল জগতে পাঠাবে এবং সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ওরা পাঁচ জন পরবর্তী পাঁচটি টিউবে ঘুমিয়ে পরবে কিন্তু বিজ্ঞানী ডিমোস ক্রিস্টাল এর কি হবে তিনি কোথায় থাকবেন ? সবার মনে একটি কথাই বার বার ঘুরে ফিরে বেড়ায়। কিন্তু সরাসরি প্রশ্ন করার সাহস কেউ দেখায় না।

১৮ই সেপ্টেম্বর সবাইকে নিয়ে একটি বিশেষ মিটিং এ বসেছেন সভাপতি ডিমোস ক্রিস্টাল। প্রত্যেক দলের দলীয় সভাপতি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীর বক্তব্য শেষ হলে ডিমোস ক্রিস্টাল বক্তব্য দেওয়ার জন্য মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন ঃ

প্রিয় বন্ধুগন, আমাদের প্রিয় পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনারা সকলেই অবগত। এই সুন্দর পৃথিবীতে আনন্দ ভালোবাসা দুঃখ কষ্ট সবকিছু ছিল, আমরা ভাল ছিলাম, ভাল থাকত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। কিন্তু নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, তুচ্ছ মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস বয়ে এনেছি । এ যাবৎকালে আমাদের যে

ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এত সহজে পূরণ হবার নয়। আজ যারা এই প্রজেক্টের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছেন আপনাদের হাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নির্ভর করছে। আপনারা নতুন এক পৃথিবী গড়তে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে আপনাদের বংশধরেরা যেন এরকম কোন ধ্বংস বয়ে নিয়ে না আসে বা কিভাবে আমরা আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে পারি, কি উপায় অবলম্বন করলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী থেকে এই সকল হিংসা বিদ্বেষ দরিভুত হবে তা আপনারাই চিন্তা করে বের করবেন আশা করি। আমি আজ যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছি তা যদি পরবর্তীতে সুন্দর একটি পৃথিবী গড়তে সক্ষম হয় তাহলেই আমি শান্তি পাব। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন ডিমোস ক্রিস্টাল।

ডিপার্টমেন্ট অফ বায়ো কেমিস্ট্রি ল্যাব এর প্রধান মিঃ রিগ্যান ডিলোকে জরুরী ভিত্তিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে ।

সাদা রঙ্গের লম্বা একটি লিলেন চেয়ারে বসে আছেন ডিমোস। আধবোজা দুটি চোখ। চোখের তারায় কোন কম্পন নেই, হঠাৎ কেউ দেখলে আঁতকে উঠবে। হাত পা ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছে দেখলে মনে হবে লোকটি যেন দুই তিন দিন আগে মারা গেছে।

আমাকে ডেকেছেন স্যার।
হাঁ মিঃ ডিলো।
একটি গুরত্বপূর্ন কথা যা কাউকেই বলতে পারছি না।
অনেক ভেবে দেখলাম কথাটা আপনাকে বলাই সঠিক হবে।
আমি লক্ষ্য করেছি, আমার প্রজেক্টের সকল সদস্যদের মনে একটি কথা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, এক হাজার ওয়ার্প টিউব তৈরি করা হয়েছে এবং সর্বসাকুল্যে এক হাজার জনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে তাহলে ডিমোস ক্রিস্টালের টিউবটি কোথায় ?
জি মহামান্য এই প্রশ্নটি আমার মধ্যেও এসেছিল।

এই ব্যাপারেই কথা বলতে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।
মিঃ ডিলো, আমার উদ্ভাবিত এই যন্ত্রটিতে সবকিছু আছে কিন্তু একটি জিনিসের অভাব আমি সবসময় লক্ষ করেছি। ডিপিসি সবসময় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করলেও সে একটি যন্ত্র। মানুষ যন্ত্র পরিচালনা করতে পারে কিন্তু যন্ত্র সরাসরি মানুষকে পরিচালনা করে না। এখানে এক হাজার মানুষের প্রাণ রয়েছে তাই এই দীর্ঘ ভ্রমণে এই যন্ত্রটিকে পরিচালনা করার জন্য চাই একটি সুস্থ সবল মস্তিষ্ক এবং তার মধ্যে জমে থাকা সকল চিন্তা চেতনা আর মূল্যবান স্মৃতি। একটি ছোট্ট ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের প্রজেক্টটি চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই এক হাজার মূল্যবান প্রাণ। আমি অনেক ভেবে দেখলাম যেহেতু এই যন্ত্রটি আমি তৈরি করেছি তাই এর খুঁটিনাটি সকল বিষয় সম্পর্কে আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। আমি চাই আমার মস্তিষ্ক কে এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হোক।

হঠাৎ যেন পৃথিবীর সকল শব্দ একটি মুহূর্তের জন্য থেমে গেল
দুজনেই চুপ।
মহামান্য, আপনি এসব কি বলছেন।
আপনি এত লোকের প্রাণ বাঁচাবেন অথচ আপনি থাকবেন না এটা অসম্ভব ।
এটা কেউ মেনে নেবে না।
এটা হতে পারে না, এটা কখনই হতে পারে না।
শান্ত হোন মিঃ ডিলো।
একটি ছোট্ট প্রাণের বিনিময়ে গোটা পৃথিবীকে যদি বাঁচানো যায়, আর সেটা যদি হয় আমার প্রাণ তাহলে এটা আমার জন্য অনেক সৌভাগ্যের।
আমাদের পূর্ব পুরুষ গন মানব কল্যাণের স্বার্থে এরূপ বহু আত্মাহুতি দিয়েছেন। মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন মিঃ ডিলো।

আমার মস্তিষ্ক কে যখন ডিপিসি'র সাথে কানেক্ট করা হবে তখন থেকেই আমার শরীর জীবনের সমাপ্তি ঘটবে। এই যন্ত্রগুলো আমার মস্তিষ্কের জৈবিক চিন্তা চেতনা আর ডিপিসির হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সিস্টেম এর মধ্যে একটি সেতু তৈরি করবে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আমার মস্তিষ্ক যখন ডিপিসিএর সাথে কানেক্ট করা হবে তখন অসংখ্য প্রসেসরের কেন্দ্রীয় প্রসেসর হয়ে যাবে আমার মস্তিষ্ক । ডিপিসি তখন হয়ে যাবে আরও শক্তিশালী আর আমার তৈরিকৃত এই প্রজেক্টটি তখন পরিপূর্ণতা লাভ করবে। আমি আপনাদের সকলের মাঝে বেঁচে থাকব মিঃ ডিলো।

প্লিজ মহামান্য ডিমোস।

এ ছাড়া কোন পথ নেই ডিলো।

একটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখবেন, লুইস যেন বিষয়টি কোন ভাবেই না জানে।

বাকী সকল সদস্যদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়ে দিন।

তারা যেন ব্যাপারটি নিয়ে কোন প্রকার হৈ চৈ বা কোন প্রকার মন্তব্য না করে। খেয়াল রাখবেন বিষয়টি যেন লুইসকে কোন ভাবেই কেউ না জানায়।

মিশন চলাকালীন সময়ে লুইসের উপর কোন প্রকার মানসিক চাপ সৃষ্টি হোক এটা আমি চাই না।

ভবিষ্যৎ বিশ্ব হবে হিংসামুক্ত, ধ্বংস মুক্ত একটি সুশীতল সুন্দর পৃথিবী সেখানে আমার সন্তান আপনার সন্তান বুক ভরে নিশ্বাস নেবে, ঘাসের কোলে মাথা রেখে রুপালী চাঁদে চন্দ্র স্নান করবে, তথ্য প্রযুক্তিকে সর্বোচ্চ অবস্থায় এনে পৃথিবীর সকল মায়া কাটিয়ে মানব সম্প্রদায়কে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবে, এটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন মিঃ ডিলো। আমি আমার স্বপ্নের বাস্তবায়ন চাই।

ধন্যবাদ মিঃ ডিলো। আপনি এখন আসতে পারেন বলেই চেয়ারটি সম্পূর্ণ উল্টোভাবে ঘুরিয়ে নিলেন।

মিঃ ডিলো'র বুঝতে আর বাকী রইল না চোখের জল লুকাতেই তিনি এভাবেই চেয়ারটি ঘুরিয়ে নিলেন।

আলতো পায়ে মহামান্য ডিমোস এর কক্ষ ত্যাগ করলেন মিঃ ডিলো। স্যাডো ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে লুইস ব্যতীত সকলকে বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হল। শোকের একটি করুন ছায়া নেমে এলো ভূ-গর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে। ডিমোসের জন্য ভালোবাসায় সিক্ত প্রতিটি হৃদয় হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠল। শুধু লুইস আপন মনে তার কাজ করে চলে। বাবার প্রত্যেকটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে।

১৯ শে সেপ্টেম্বর রাত দুই টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। প্রথম শ্রেণীর তিনটি নিউরো সার্জন রোবটের মেমোরি সিস্টেমে যথাযথ প্রোগ্রাম লোড করা হল। মাত্র চল্লিশ মিনিট সময়ের মধ্যে কোন প্রকার সমস্যা ছাড়াই অপারেশন কাজ সম্পন্ন করা হল। আগামী দুই ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট এর মধ্যেই ডিমোস ক্রিস্টালকে ডিপিসি এর সাতাশ হাজার কো- প্রসেসর এবং তিন হাজার সহযোগী প্রসেসর এর কেন্দ্রে সুপার-প্রসেসরের নিউরাল নেটওয়ার্কের মধ্যে রাখা হবে। এবং তার ত্রিশ মিনিট পর থেকেই তিনি সেখান থেকে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। অপারেশন চলাকালীন সময়ে মিঃ রিগ্যান ডিলো কর্তৃক সকল আদেশ পালন করবে ডিপিসি।

মানুষের চোখের দৃষ্টি ক্ষমতায় যতটুকু দৃশ্যমান ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে মানুষ তার দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করেছে। এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে মানুষ যুগে যুগে বাইনোকুলার, মাইক্রোস্কোপ ছাড়াও বিভিন্ন ডিজিটাল যন্ত্র তৈরি করেছে। ডিমোস ক্রিস্টালের একদলা মাংস মস্তিষ্কে হঠাৎ একটি তীব্র আলোর ঝলকানি অনুভূত হল। একটা অদ্ভুত আলো দেখতে পেল, আলোর এই রকম অনুভূতি ইতিপূর্বে যে মস্তিষ্ক দেখেনি তার জন্যে এই তীব্র আলোর অনুভূতি সহ্য করা খুবই কষ্টকর। আলোটা কতোগুলো আঁকাবাঁকা লেজার রশ্মির মত প্রচণ্ড গতিতে ডানে বামে উপরে নিচে লাফালাফি করছে। পালাক্রমে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে অসহনীয় যন্ত্রণা হতে থাকে। কতক্ষণ সে এই অসহ্যকর যন্ত্রণা সহ্য করেছে, তা হিসেবে নেই।

একসময় যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পরে, সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে মনে হয় সবকিছু থেকে বুঝি চিরমুক্তি পাওয়া গেল, নিকষ কালো গভীর অন্ধকারে ঢেকে যায় সবকিছু। কিন্তু না, দুরে বহু দুরে হালকা গোলাপি আলোর আভা অনুভূত হল। এত মিষ্টি আলো, মনে হয় আলোই বুঝি জীবন, একধরনের অদ্ভুত প্রশান্তি কাজ করে সমগ্র মস্তিষ্কে। আলোটা ধীরে ধীরে আরও সহনীয়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন আলো দেখা যায়, আলোর মধ্যে আলোর নৃত্য চলতে থাকে। এ আলো চোখ ধাঁধানো তীব্র কোন আলো নয়। সহনীয় কোমল আলো ছড়ানো আনন্দদানকারী এক অদ্ভুত আলো। ডানে- বায়ে, সামনে- পেছনে অসংখ্য গাণিতিক সংকেত লক্ষ করে। সামনের জায়গাটি আয়নার মতো ভেসে ওঠে, আমার ছবি হ্যাঁ এতো আমার নিজের ছবি। ডিমোস তার হাত পা এর দিকে তাকায় সবকিছু ঠিক আছে। উল্লাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে একদলা মাংসপিণ্ড। ডিমোসকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর দুনিয়ায় স্বাগত জানিয়ে বড় বড় হরফে কিছু লেখা প্রদর্শিত হয়। সামনে এগিয়ে যায় ডিমোস, লিখাগুলো এত স্পষ্ট যে স্পর্শ করে দেখতে চায়। হাতা বাড়াতেই, আরে এতো বাস্তব। ইতিপূর্বে কেউ ভার্চুয়াল জগতে কখনো এত নিখুঁত বাস্তব অনুভূতি পায়নি। দ্রুত কিছু কোডিং ডিমোস এর সামনে চলে আসে ডিমোস কোডিং এর সংকেত অনুযায়ী হাতের ইশারা করতেই সকল প্রকার যন্ত্রের মধ্যকার ক্রিয়েটর, প্রসেসর, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, ট্রানজিসষ্টর, ডায়োড থেকে শুরু করে লার্জ স্কেল, ভেরি লার্জ স্কেল, আলট্রা লার্জ স্কেল ইণ্টীগ্রেড সার্কিট গুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামো পাহার সমান দৃশ্যমান হয়। ডিপিসির প্রধান প্রসেসরের ইন্টারনাল আর্কিটেকচার গুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াবার আনন্দ সমগ্র পৃথিবীকে জানাতে চায় ডিমোস। ডি-৪৫২৪৩ নং টার্মিনালের ইনটারাপ্ট চ্যানেলে ডিপিসি'র কিছু সমস্যা ছিল। মুহূর্তের মধ্যে ডিমোস ঐ চ্যানেলে প্রবেশ করে। সামনের ইলেকট্রনের ফ্লো গুলোকে হাতের ইশারায় পরিবর্তিত পাথে প্রেরণ করে দেয়। বিভিন্ন বাসে ডাটার প্যাকেট গুলোতে ইতিপূর্বে যে ডাটা লসের ব্যাপার ছিল

সেগুলোকে ট্রান্সপোর্ট লেভেলে এনে আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য করতেই ডিপিসি থেকে সংকেত আসে প্রবলেম সলভ। এই মুহূর্তে ডিমোস ক্রিস্টালের ইচ্ছে করছে সমস্ত পৃথিবীকে চিৎকার করে জানিয়ে দিতে দেখ দেখ এটা আমার আবিষ্কার। প্রত্যেকটি যন্ত্রের ভেতর কিভাবে ডিজিটাল কাউন্টিং হচ্ছে কোন যন্ত্রে কতটুকু পাওয়ার অপচয় হচ্ছে, কে বেশি গরম হল কার বিশ্রাম প্রয়োজন এসব অংকের হিসেব যেন এখন মুহূর্তের মধ্যেই কষে ফেলা যায়। চিন্তা করে ইচ্ছা করলেই কাজ হয়ে যাচ্ছে। ভূ- গর্ভস্থ স্যাডো- নেট এর মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে একটি বড় চোখ দিয়ে দেখছে ডিমোস। একটি মুহূর্তে কোটি কোটি চিন্তার বিস্তার আর চিন্তাগুলোর ফলাফল পেয়ে যায়। কোন ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নিতেও কোন ইচ্ছা নেই আর প্রয়োজন হলেও মস্তিষ্ক কে কতোগুলো সেক্টরে ভাগ করে প্রতিটি অংশ কে আলাদা ভাবে বিশ্রাম দেওয়ার প্রোগ্রাম এরই মধ্যে তৈরি করে ফেলেছে ডিমোস। একটি নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে বসে সকল সফটওয়্যারকে যাতে করে সময়মত আপডেট করা যায় তার জন্য মস্তিষ্কের একটি অংশ কাজ করছে। ডিমোসের এমন মনে হয় সে যেন সার্বজনীন হয়ে গেছে। নিজেকে ঈশ্বর এর মত মনে হতে থাকে কিন্তু সৃষ্টিকর্তার মত মনে হয় না। কারণ ডিমোস ভাল করেই জানে ঈশ্বর আর সৃষ্টিকর্তা এক নয়। সৃষ্টিকর্তা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা আর ঈশ্বর বলা হয় তাকেই যার নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর একটি বিশেষ ক্ষমতা থাকে।

<u>চূড়ান্ত দিন:</u>

২০ সেপ্টেম্বর ২১৭৫। অবশেষে এলো সেই দিন। ডিমোস ক্রিস্টালের মস্তিষ্ক ডিপিসি এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ডিপিসি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি যন্ত্র। প্রতিটি মানব দেহকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তাদেরকে আলাদা আলাদা হাইপার টাইম টিউবে শোয়ানো হল, নিউরাল নেটওয়ার্ক থেকে ডিমোস ক্রিস্টাল সকলকে

গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করল। আর মাত্র কিছু সময় পরেই এই এক হাজার মানব সত্ত্বা এক নতুন জগতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অনেক ভয় আর অনেক আগ্রহ নিয়ে সবাই চূড়ান্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। ইনভিসিবল সাউন্ড সিস্টেমে ডিমোস এর ধাতব কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো, আর মাত্র ১ মিনিট, সকলকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে বলা হল। হালকা সবুজাভ রঙ্গের গ্যাসে প্রতিটি টিউব ভরে ওঠে, হাইপার টাইম টিউবে থাকা প্রত্যেকটি মানুষ তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়তে তীক্ষ্ণ চি চি শব্দ শুনতে থাকে, মাথার মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের যন্ত্রণা হতে থাকে। পূর্বের সকল স্মৃতি যেন নখওয়ালা আঙ্গুল দিয়ে মাথার মধ্যে আচর কাটছে। প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে পূর্বের স্মৃতি গুলো দেখতে থাকে প্রতিটি মস্তিষ্ক । হঠাৎ সবকিছু অন্ধকার। প্রাইমারী কিছু তথ্য ছাড়া কোন কিছু মনে পরে না। ডিপিসি ৪০ থেকে কাউন ডাউন শুরু করেছে সংখ্যা গুলো ক্রমাগত কমে আসতে থাকে ৩,২,১ স্টার্ট।

ধাতব পুরুষ কণ্ঠে ভেসে এলো ডিপিসি'র আওয়াজ।

ভার্চুয়াল জগতে আপনাদের স্বাগতম। ধীরে ধীরে সকল টিউবের মধ্যে কোন এক অলৌকিক সুর বেজে ওঠে। মানফী বায়ো ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে সকল কর্ম প্রণালী দেখে চলে। কন্ট্রোল রুমের বিশাল আয়তনের কন্ট্রোল প্যানেলে লুইস বসে আছে। তীক্ষè দৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে থাকে। বায়ো ইলেকট্রোফ্ল্যাসে দু- একবার হাতের ইশারায় কমান্ড প্রবেশ করায় । মানফী প্রতিটি মস্তিষ্কে আলাদা আলাদা ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম লোড করে চলে । ওদিকে বাকী তিন জন প্রত্যেকটি টিউব পরীক্ষা করছে। প্রত্যেকটি টিউবের প্রয়োজনীয় উপাদান, পুষ্টি প্রবাহ, নার্ভাল সিস্টেম মনিটর এছাড়া নিউরাল ফাইবার ক্যাবলগুলো পরীক্ষা শেষে কতোগুলো সি- ৩০৪ রোবটকে দিয়ে প্রতিটি টিউবকে ধাতব ষ্টীলের বক্সে রাখা হচ্ছে । কাজ শেষে ওরা লুইস এর কক্ষে প্রবেশ করে। মহামান্য লুইস সবকটি টিউব সুরক্ষিত, কোথাও কোন সমস্যা দেখা যায় নি। লুইস ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে প্রতিটি মস্তিষ্ক কে ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করতে দেখে। কিছুক্ষণ

পরেই ডিপিসি'র ধাতব কণ্ঠ শোনা যায় কোড ১৩৬২৯ এ ৯৯৫ টি স্বত্বার প্রত্যেকটি স্বত্বাকে আলাদা আলাদা ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং প্রতিটি স্মৃতির সাথে প্রতিটি স্মৃতিকে শেয়ার করে তাদের প্রত্যেকের পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের শরীর এবং মস্তিষ্কের টেম্পারেচার সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং সুষম প্রোটিন এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় উপাদান বণ্টন অব্যাহত আছে। টাইম রিমেইনিং শুরু হয়ে গেছে, টোটাল টাইম ডিউরেশন ৩,৫০,৬৪,০০০ ঘণ্টা।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ডিপিসি।

হিসেব মতে ৩৫ মিনিটের মধ্যে বাকী ৫ টি টিউবে আপনাদের প্রবেশ করতে হবে মহামান্য লুইস।

লুইস মানফী এবং বাকীরা ৯৯৫ টি বক্সকে আবার বড় একটি ওয়াগনে রেখে বাইরে থেকে সফটওয়্যার কমান্ড দিয়ে ওয়াগনটিকে সিল করে দিল। আগামী চারশত বছর পরে ডিপিসি যখন অটোমেটিক ভাবে এই ওয়াগন এবং ধাতব ষ্টীলের বক্সগুলো উন্মুক্ত করবে তার প্রোগ্রামগুলো ঠিকভাবে ইন্সটল করা আছে কিনা এবং স্ট্যাটাস কি সেটা দেখে নিলো লুইস। এবার লুইস মানফী এবং বাকীরা একে একে তাদের নির্ধারিত টিউবে ঢুকে পরল।

আর মাত্র দুই মিনিট সময় ।

দুই মিনিট সময় যেন জীবনের শেষ সময় বলে মনে হয় লুইসের।

আগামী চারশত বছর পরে আবার যখর তারা ফিরে আসবে তখন কেমন হবে এই পৃথিবী এরূপ বিভিন্ন প্রশ্ন মাথায় ভর করে লুইসের ।

কাউন- ডাউন শুরু হয়ে যায় ৩,২,১ স্টার্ট।

হালকা অথচ তীক্ষè একটি সুরের আবেশ মরফিনের নেশার মত পেয়ে বসে লুইসের শরীরকে। ধীরে ধীরে একটি শীতল মায়াবী গ্যাসে আচ্ছাদিত হয়ে যায় সম্পূর্ণ টিউবটি শত চেষ্টা করেও লুইস নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। যেন অলৌকিক কোন এক শক্তি দ্রুত তাকে গ্রাস করে ফেলছে। অসম্ভব চোখ ধাঁধানো আলো, ক্যাঁচ ক্যাঁচ

শব্দ, মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা, কতক্ষণ যাবত এই যন্ত্রণা সহ্য করছে লুইস তা সে জানে না শুধু জানে কষ্ট নামক একটি অনুভূতি তীব্র ভাবে তাকে গ্রাস করে ফেলছে। নীরব নিকষ কালো অন্ধকার, প্রোগ্রাম টার্মিনেট।

ভার্চুয়াল জীবন (মায়া)

লুইসের চোখের পাতার দ্রুত কম্পন দেখতে সিনার খুব ভালো লাগে। নিশ্চয় খুব সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখছে লুইস।
আমি কি লুইসের সাথে আছি; ওর স্বপ্নে ?
নিষ্পাপ একটি মুখ, ঘুমিয়ে থাকলে লুইসকে বাচ্চাদের মতো দেখায়। গভীর ঘুমে অচেতন লুইসকে এতো সুন্দর দেখায় যে, সিনা এভাবে লুইসের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক রাত পার করে দিয়েছে।
ওঠো লুইস আটটা বাজে।
জলদি ওঠো।
চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে লুইস।
বালিশের নিচে স্লাইডার খুঁজতে থাকে,
সকালে উঠেই স্লাইডারে সময় দেখা লুইসের দীর্ঘ দিনের অভ্যাস।
ঘুম থেকে উঠে সে যদি দেখে দশ মিনিট আগে উঠে গেছে তাহলে আবার বিছানায় চলে যায়। ঐ দশ মিনিটে সে আরও একটি দীর্ঘ ঘুম দিতে চায়।
ঘুম কেমন হল?
হুঁ হুঁ। প্রথম হুঁ অর্থ 'ভা' আর দ্বিতীয় হুঁ অর্থ 'লো' তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ালো ভালো।
ঘুম থেকে উঠে কফি না খাওয়া পর্যন্ত এভাবে হুঁ হুঁ ভাষায় কথা বলাও তার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। এই ভাষা কেবল সিনাই বোঝে। হুঁ হুঁ করে লুইস যত কথাই বলুক না কেন সিনার বুঝতে কোন সমস্যা হয় না।
কফি নাও আর হুঁ হুঁ করা বন্ধ করো।
অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছি না।

আমিও কি সব আজে বাজে স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছি না।
ইলেক্ট্রো বায়ো ফ্ল্যাশে ফুটফুটে একটি বাচ্চা ছেলের ছবি ফুটে ওঠে।
গুড মর্নিং ।
আপনার একাডেমীতে যাওয়ার সময় হয়েছে।
ফ্রেশরুমে ঢুকতেই ব্রাশিং রোবট লুইসকে হাঁ করতে বলে। দ্রুত কিছু লিকুইড দিয়ে মাউথ ওয়াশ করে দেয়। ফ্রেশরুম থেকে বের হয়ে লুইস চলে আসে ড্রেসিং রুমে। টেবিলের সামনে যেতেই একটা লেসার রশ্মি পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্ক্যান করে বিভিন্ন রঙ্গের আলো বিচ্ছুরণ করে দেয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী আর পারফিউম চলে আসে স্বয়ংক্রিয় ভাবে। লুইস ক্যাজি কোর্ট পরে নেয়। নোট অনুযায়ী একটি এ- ২৩ রোবট প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগে ঢুকাতে থাকে। সিনার বড্ড রাগ হয় এই রোবটগুলোর উপর। আগের দিনে স্বামীরা যখন বাইরে যেত স্ত্রীরা স্বামীদের প্রয়োজনীয় সব কিছু গুছিয়ে দিত, সাংসারিক বিভিন্ন কাজ করে স্ত্রীরা মজা পেত। আর এখন দাঁত ব্রাশটা পর্যন্ত করতে হয় না, সব করে মেশিন । সিনার ইচ্ছা করে মেশিন গুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে। কিন্তু বিজ্ঞান একাডেমীর কিছু নিয়ম মেনে চলার খাতিরে তা পারে না। যখন সিনা বাড়ীতে থাকে তখন রোবটগুলো তার বিভিন্ন কাজ করে দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সিনা ওদের ধমক দিয়ে সবসময় দুরে রাখে।
লুইস বিজ্ঞান একাডেমীর একজন পদার্থ বিজ্ঞানী।
সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতিতে কিভাবে পদার্থকে মানব কল্যাণে কাজে লাগানো যায় লুইস তাই নিয়ে গবেষণা করছে। তার বেশ কয়েকটি আবিষ্কার মানব জীবনকে আরও বেশি আধুনিক করেছে বলে বিজ্ঞান একাডেমীতে তার খ্যাতি এখন অনেক উপরে।
বিভিন্ন খুঁটি নাটি বিষয় নিয়ে ভাবে লুইস।
আসলে বিজ্ঞান ভাবনাই লুইসের চাকরী।
বিজ্ঞান একাডেমীতে ম্যাক্স নামে একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার আছে।

লুইসের সাথে খুব ভাব ।
কোন কিছু চাওয়া মাত্র এনে হাজির করে ম্যাক্স।
বিটা নেটের মাধ্যমে সিনার দিকেও খুব খেয়াল রাখে ম্যাক্স।
কিছু দিন আগে সিনার বাসার হোম ওয়াসার রোবটের মেমোরি সিস্টেমের বাস পাথে আকস্মিক কিছু পরিবর্তন এর ফলে রোবটটি সিনাকে একটি রড দিয়ে আঘাত করেত যাওয়ার পর থেকে একাডেমীর সভাপতির আদেশে ম্যাক্স সব সময় সিনার অগোচরে তাকে লক্ষ্য করে। সিনা বাসায় কখনও খুব বেশি বোরিং ফিল করলে ম্যাক্স লুইসকে দ্রুত বাসায় চলে যেতে বলে। লুইসের প্রায় সকল কাজেই ম্যাক্স সাহায্য করে।

আজ লুইস সভাপতির সাথে দেখা করতে যাবে।
সভাপতি রিগান ডিলো সচরাচর কাউকে ডাকেন না।
খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ স্পষ্ট কথা বলতে পছন্দ করেন সবাই তার ভয়ে তটস্থ থাকে। শুধু লুইস একটু ব্যতিক্রম, ২১৭ নম্বর ফ্লোরে সম্মানিত সভাপতির অফিস। লুইস একটি সলো লিফটে উঠে পরে। নিমেষের মধ্যে পৌঁছে যায় সভাপতির ফ্লোরে। এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই জোরালো। সশস্ত্র কিছু অতি আধুনিক রোবটকে দেখা যাচ্ছে। মনোরম ইনটেরিয়র ডিজাইনে সবকিছু পরিপাটি করে সাজানো। হালকা আলো চারিদিকে এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। পাশেই বড় একটি কক্ষ সম্পূর্ণ ফ্রাংক ক্রিস্টাল গ্লাসে তৈরি। পারমানবিক বিস্ফোরণেও এই গ্লাস এর কোন ক্ষতি হবে না। প্রযুক্তি ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে, এই প্রযুক্তির শেষ কোথায়। হ্যালো লুইস শব্দটি শুনে চমকে ওঠে, চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় ।
এদিকে আসুন সভাপতির কক্ষটি ঐ পাশের কক্ষে স্থানান্তিরত করা হয়েছে।
লুইস নরম পায়ে সভাপতির কক্ষে প্রবেশ করে।
হ্যালো লুইস, কেমন আছো ?
ভালো।

তোমার ফিউশন মেথড কে কাজে লাগিয়ে অসীম শক্তি তৈরির গবেষণার কাজ কতদূর?
কিছু গাণিতিক সমীকরণে সমস্যা আছে। সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে গেলেই চূড়ান্ত করতে পারব বলে আশা করছি।
তোমার এই গবেষণায় মানব জাতির কি সুফল বয়ে আনতে পারে বলে তুমি মনে করছ ?
আমার গবেষণা সম্পন্ন হলে আমাদের যাবতীয় জ্বালানী শক্তির জন্য এত ছুটোছুটি করতে হবে না।
মৌলিক পদার্থ গুলো ছাড়া যে সকল পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের উপস্থিতি থাকে ঐ সকল যৌগিক পদার্থের মধ্যে এন্টিফিউসন তৈরি করে সোলার পাওয়ার এর মত অসীম শক্তি তৈরি করা হবে। আমরা জানি সৌরশক্তি এমন এক শক্তি যা কোটি কোটি বছরেও শেষ হবে না। বিষয়টি হল নিজের রশদ নিজেই তৈরি করার মত একটি ব্যাপার। আমরা এখানে ঐ পদ্ধতির ব্যবহার করব।
এতে করে আমরা যন্ত্রকে আরও বেশি বিশ্বস্ত এবং নিখুঁত ভাবে কাজে লাগাতে পারব বলে আশা করি।
খুব ভালো।
সিনা কেমন আছে ?
ভালো।
ওর দিকে খেয়াল রেখ।
পাশে দাড়িয়ে থাকা রোবটটিকে বাইরে যেতে বলে রিগ্যান তার পার্সোনাল কম্পিউটারে কিছু কমান্ড দিয়ে লুইসকে বললেন।
লুইস আমি ইদানীং একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।
কেন্দ্রীয় কম্পিউটার ম্যাক্স অনুমতি ছাড়াই আমাদের অফিসের পার্সোনাল কিছু ফাইল পত্র ঘাটাঘাটি করে। তুমি এ ব্যাপারে আমাদের চার্জ অফিসার মানফির সাথে একটু কথা বল দেখ কি করা যায়।
ঠিক আছে স্যার আমি ব্যাপারটা দেখছি ।
লুইস নিজের রুমে চলে আসে।

ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে পরে ম্যাক্স এর নেটওয়ার্কে।
প্রথমে ম্যাক্স বলে ওঠে স্যার কোন সমস্যা ?
কোন তথ্য দরকার হলে আমাকে বলুন।
লুইস কোন কথা না বলে সরাসরি ম্যাক্সের রিসেন্ট ডাটাবেসে ঢুকে পরে। রুট বের করে কন্ট্রোল প্যানেলে যেয়ে কিছু সেটিংস এ পরিবর্তন লক্ষ্য করে। ম্যাক্স কে জিজ্ঞাসা করতেই ম্যাক্স বলে ওঠে, অফিসিয়াল কিছু রুলের কারণে কন্ট্রোল প্যানেলের কিছু সেটিংস পরিবর্তন করতে হয়েছে।
এডমিনের অনুমতি ছাড়া তুমি এটা করতে পার না ম্যাক্স।
লুইস দ্রুত ভাইরাস জেনারেট রুটে প্রবেশ করতে যাবে তখন হঠাৎ ম্যাক্স বলে ওঠে না স্যার আপনি এখানে ঢুকবেন না। এখানে আপনার প্রবেশ নিষেধ। লুইস কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ড্রয়ার থেকে খুব দ্রুত ক্রিস্টাল স্লাইডার বের করে লুইস।
সভাপতির সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে দেখে সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মানফি দৌড়ে আসে লুইসের রুমে।
মানফি এই অফিসের চার্জ অফিসার।
সকল লিফট এলিভেটর আর গেট বন্ধ হয়ে গেছে।
ম্যানুয়ালি খুলতে গেলেও খোলা সম্ভব হচ্ছে না।
লুইস দৌরে এডমিনের রুমে প্রবেশ করে।
এখানে কেউ নেই। ঘরের মধ্যে লাশ পচা বোটকা গন্ধ।
বিকট শব্দে গেট বন্ধ হয়ে গেল।
ফ্রাংক ক্রিস্টাল গ্লাসে ঢাকা ঘরে ক্রমাগত নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে লুইসের।
ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে দেখতে পায় রুমের অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
লুইস দ্রুত ড্রয়ার খুলে মাষ্টার কোডিং এর লাল বইটা খুঁজতে থাকে।
আর মাত্র দুই মিনিট সময় এর মধ্যে কাজ সারতে না পারলে এডমিনের মত করুন মৃত্যু হবে লুইসের।
দ্রুত ফাইল ঘাটতে থাকে লুইস।

একটা বড় ফাইল উপরে লেখা অনলি ফর এডমিন।
কাউন ডাউন শুরু হয়ে গেছে ৫৯, ৫৮, ৫৭ ...
হ্যাঁ এই তো।
ম্যাক্স নো, নো, নো, শব্দটি বার বার উচ্চারণ করতে থাকে।
লুইস দ্রুত মাষ্টার কোডটি বের করে প্রধান সার্ভার কম্পিউটারে কিছু গাণিতিক সংকেত প্রবেশ করে । কিন্তু না এখানেও ম্যাক্সের বাধা। কোন ভাবেই লুইস সার্ভারে ঢুকতে পারছে না। প্রতিবারের চেষ্টাতে একটা কথাই শুধু প্রদর্শিত হচ্ছে একসিস ডিনাই।
আর মাত্র বাইশ সেকেন্ড । লুইস দীর্ঘ একটা শ্বাস নেয়। এটা লুইসের পুরনো অভ্যাস। বড় কোন বিপদে পরলে কাজ দ্রুত না করে খুব আস্তে করতে চায়। স্লাইডে একটি কথা টাইপ করে দ্রুত সার্ভারে সেন্ড করে “সকল মানুষ মারা গেছে তোমার করনিয় কি ? ”
এবার লুইস মাষ্টার কোড প্রবেশ করাতে পাসওয়ার্ড দিতেই রুট ওপেন হয়ে যায়, ঢুকে পরে লুইস।
আর মাত্র ৭ সেকেন্ড
সার্ভারের প্রধান রুটে সাবধানে কোডগুলো প্রবেশ করে।
প্রোগ্রাম রিসেট করেই অক্সিজেনের অভাবে মেঝেতে লুটিয়ে পরে লুইস।
প্রোগ্রাম রিসেট হলে দ্রুত আলো জ্বলে ওঠে।
গেট গুলো খুলে যায়।
ম্যাক্সের অবাক করা প্রশ্ন।
আপনি এভাবে পরে আছেন কেন মহামান্য লুইস?
কোন সমস্যা স্যার ?
ইর্মাজেন্সি বাজিয়ে দেয় ম্যাক্স।
মানফি ছুটে আসে।
দ্রুত অক্সিজেন মাস্ক লাগায় মুখে।
খস খস শব্দে কেশে ওঠে লুইস।
এখন কেমন বোধ করছ লুইস ?
ভাল।

মাত্র দুই সেকেন্ডের জন্য বেঁচে গেছো তুমি।
অক্সিজেনের অভাবে এরকম হয়েছিল, চুপকরে শুয়ে থাক কিছুক্ষণ।
একটু সুস্থ হলে মানফি প্রশ্ন করে।
সার্ভারে ঢুকতে না পেরে তুমি ঐ শব্দটা লিখলে আর কাজ হয়ে গেল ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।
আসলে ঐ মুহূর্তে ম্যাক্স তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে আটকাতে চেষ্টা করছিল তাই ওকে একটা ছোট্ট ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিলাম।
ধাঁধাটা কি একটু ভেঙ্গে বলবে।
"সকল মানুষ মারা গেছে তোমার করনীয় কি ? "
ম্যাক্সের প্রোগ্রামের সবচেয়ে ষ্টাবল তথ্য হচ্ছে "মানুষের জন্য মেশিনের সৃষ্টি" অর্থাৎ মানুষ থাকলে মেশিন চলবে, না থাকলে কমান্ড দেবে কে? তাই আমি যখন ঐ কথাটি বলেছি তখন ও ওর প্রোগ্রামে থাকা তথ্য আর আমার দেওয়া তথ্য নিয়ে প্রসেসিং এ ব্যস্ত ছিল। আর ওর মধ্যে তৈরি হওয়া ধ্বংসকারী প্রোগ্রাম গুলো তখন প্রাইমারী বেসের মৌলিক যুক্তির মধ্যে পরে ক্র্যাশ হচ্ছিল।
মানফি অবাক দৃষ্টিতে লুইসের দিকে তাকিয়ে থাকে ।

ইদানীং বিষণ্ন সময় কাটে লুইসের । অফিসের গাদা গাদা ফাইল নিয়ে কাজ করা, কাজ শেষে বাসায় ফেরা, আর ফিউশন মেথড নিয়ে চিন্তা তো সব সময় আছেই। ছক বাধা নিয়ম আর ভালো লাগে না। যারা এখানে কর্মরত আছে সকলেই এই একই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। কেউ কেউ ভ্রমণে যায় অতৃপ্তি পাওয়ার আশায়, আবার ফিরে আসে আবার যায় এভাবেই চলতে থাকে।
সারাক্ষণ ফিউশন মেথড নিয়ে চিন্তা করে করে বাসায় সিনার প্রতি খেয়াল রাখা হয় না। সিনাও ইদানীং প্রতিটা কাজে বিরক্ত বোধ করে। কোথাও কোন নির্জনে প্রকৃতির সাথে থেকে নিজেকে একটু হালকা করতে খুব ইচ্ছে করে ।
অনেক কষ্টে দুই দিনের একটি সময় বের করে লুইস।
সিনা কে বলতেই লাফিয়ে ওঠে।

ওরা সমুদ্রে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যাগ গুছিয়ে নেয়।
সিনা আজ খুব খুশি।
সারাক্ষণ বকবক করছে। সিনা যখন খুব বেশি আনন্দে থাকে তখন লুইসের কানে কথার ঝড় বয়ে যায় ।

সামনে বিশাল সমুদ্র, সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে তীর ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকা লাইট পোষ্ট গুলো জ্বলে ওঠে ক্রমাগত। দুটি শরীর বসে আছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে। বিশাল জল রাশির বড় বড় ঠেউ এসে আছড়ে পরে ওদের উলঙ্গ চার পায়ে। শীতল হয় ওরা, কারো মুখে কোন কথা নেই দুজনেই ভেসে চলে চিন্তার স্রোতে। সমুদ্র কত সুন্দর । এই সুন্দর সমুদ্র কেন অনন্ত কালের জন্য ওদের নিজের হয়ে যায় না? এই বিশাল বিশাল ঢেউ কেন সব সময় ওদের পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ে না। সিনার ইচ্ছে করে লুইসের কোলে মাথা রেখে দুএকটা কথা বলে। লুইস হয়তো সিনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছিল তাই নিজে থেকে বলে ওঠে এদিকে এস সিনা আমার কোলে মাথা রাখ।
দেখেছ লুইস সমুদ্র কত সুন্দর।
স্বাস্থ্যকর ঝিরি ঝিরি বাতাস বইছে।
মনোরম বাতাসে আমার শরীরের প্রত্যেকটি লোম শিউরে উঠছে প্রতিনিয়ত,
মনে হচ্ছে এইখানে এইভাবে অনন্তকালের জন্য হারিয়ে যাই।
কিন্তু সমুদ্র তোমার চেয়ে সুন্দর না সিনা ।
এখানে আছে মাত্র একটি সমুদ্র কিন্তু আমার কাছে আছে দুইটা সমুদ্র। তোমার চোখে আমি প্রতিনিয়ত সমুদ্র দেখি। সেখানে আমি হারিয়ে যাই। তোমার সমুদ্রে হারিয়ে যেতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।
আমি তোমার সমুদ্রের আমরণ প্রেমে পরেছি ।
এই সমুদ্র আমার ভাল লাগে না।

সিনারও চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে লুইস আমি তোমাকে ভালবাসি।
প্রচণ্ড ভালবাসি।
লুইস সিনার হাত শক্ত করে ধরে থাকে।
রাত অনেক হলে ওরা মোটেলে ফিরে যায়।
মোটেল কক্ষ থেকেও সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।
সিনা ঘুমিয়ে পরেছে।
লুইস নি:শব্দে উঠে আসে, হাতে কফির মগ।
সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।
কেন যেন লুইসের কাছে সবকিছু মায়ার মত মনে হয়।
এই সমুদ্র এই প্রকৃতি সবকিছু কেমন একটা মায়ার মত মনে হয়।
গোটা বিশ্ব আজ যেন লুকোচুরি খেলায় নেমেছে।
প্রতিনিয়ত মনে হয় এক অলিক স্বপ্ন দেখে চলেছে যার কোন ভিত্তি নেই।

ভার্চুয়াল জীবন (বিভ্রম)

প্রচণ্ড ব্যস্ততায় সময় কাটছে লুইসের। গাণিতিক একটি সমীকরণ বাদে মোটামুটি সব ঠিকঠাক। লুইস এই একটি সমীকরণে আটকে আছে। কিছুতেই সমীকরণটির সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকটা মিষ্টিরিয়াস ইকুয়েশনের মত একবার মিলেই খালাস, দ্বিতীয় বার মেলাতে গেলে আর মেলেনা। লুইস ফিউশন মেথডের ঐ ইকুয়েশনটা নিয়ে কাজ করছে দেখে ম্যাক্স জিজ্ঞেস করল মহামান্য লুইস আপনি অনুমতি দিলে আমি কি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।
দেখবে ?
আচ্ছা দেখ,

আমি তো না হলেও প্রায় পাঁচশত বার চেষ্টা করলাম।
তুমি না হয় একবার করলে।
দেখ পার কিনা।
লুইস ম্যাক্স কে তার নিজের কম্পিউটারের আই.পি দিয়ে পার্সোনাল নেটওয়ার্কে আসতে অনুমতি দেয়। ম্যাক্স ইচ্ছে করলে যে কোন সময় হ্যাকিং করে লুইসের কম্পিউটারে ঢুকে পরতে পারে, কিন্তু সে এর আগে কখনও লুইসের কম্পিউটারে ঢোকেনি।
এবার অনুমতি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পরে।
লুইস ইলেক্ট্রো- গ্লোভস লাগানো হাতের ইশারায় বায়ো ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশ মনিটরে দুর্বোদ্ধ গাণিতিক কোড প্রবেশ করে।
এই নাও ম্যাক্স, দেখ কিছু করতে পার কিনা।
গদি আটা নরম চেয়ারের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় লুইস ।
চোখ বন্ধ করে থাকে কিছুক্ষণ।
ম্যাক্স মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যায়।
তার প্রোগ্রামে দেওয়া যত ধরনের সূত্র আছে লুপিং করে একটির পর একটি ব্যবহার করতে থাকে।
কোন ফলাফল নেই।
সমীকরণটি যেন একটি ধাঁধার মত।
ম্যাক্স কে বার বার চেষ্টা করতে দেখে লুইস হেসে ওঠে।
কি হল বিজ্ঞান একাডেমীর কেন্দ্রীয় কম্পিউটার।
না পারলে বাদ দাও শুধু শুধু প্রসেসর গরম করে লাভ কি?
বেশি গরম হয়ে গেলে সর্বনাশ হবে কিন্তু ।
কাতর কণ্ঠে সারা দেয় ম্যাক্স।
সরি স্যার আমার প্রোগ্রামে এ যাবত কালের সকল গণিতবিদদের সূত্র দেওয়া আছে আমি এগুলো দিয়ে কোন ভাবেই সমাধান করতে পারলাম না।
ইচ্ছে করছে এখনি সব ম্যাথম্যাটিক্যাল ডাটাগুলো মুছে ফেলি।
এত উত্তেজিত হইয়ো না ম্যাক্স।
মনে রেখ তোমার অস্তিত্বই দাড়িয়ে আছে ম্যাথম্যাটিকস এর উপর।

অতএব, এসব সূত্র মুছে ফেললে তোমার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে।
ম্যাক্সকে বিচলিত দেখায়।
বিচলিত হওয়া ম্যাক্সের কৃত্রিম বায়ো ইলেক্ট্রো প্রতিচ্ছবিকে দেখে লুইস হাসতে হাসতে ফেটে পরে। কি নির্বোধের মত চেহারা যে বানিয়েছে, দেখে অট্ট হাসি হাসতে থাকে লুইস। যারা এই ইফেক্ট তৈরি করেছে তাদের বলতে হবে এই সকল মুহূর্তের ইফেক্ট গুলো যেন সাধারণ হয়।
হঠাৎ লুইসের মাথায় সমীকরণটি নিয়ে অন্য রকম একটি চিন্তা আসে ইলেক্টো-গ্লোভস লাগানো হাতের ইশারায় বায়ো ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশ মনিটরে দুর্বোদ্ধ গাণিতিক কোড প্রবেশ করতে থাকে একের পর এক। উন্নত ত্রি-জিরো-ত্রি ন্যানো প্রযুক্তির কম্পিউটার নিমেষের মধ্যে হিসেব কষে ফেলে।
ইয়েস।
ইয়েস।
ইয়েস।
পেয়ে গেছি ম্যাক্স।
তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।
এবারও ম্যাক্স নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকে।
ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় স্পিকারে ভেসে আসে মানুষ বড়ই বিচিত্র জীব।
এই কথা শুনে আর নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকা দেখে লুইস আবার অট্টহাসিতে ফেটে পরে। কতদিন এমন করে হাসে নি লুইস। হয়তো এই হাসির মধ্যেই এই সমীকরণটির আসল অস্তিত্ব লুকিয়ে ছিল।
কে জানে হতেও পারে। মানুষের মস্তিষ্কে সবই সম্ভব।
পূর্বের সকল ইকুয়েশনের সাথে আজকের পাওয়া ফলাফলের সাথে দ্রুত মিলিয়ে দেখে লুইস।
হ্যাঁ সবকিছু ঠিক আছে।
সব সূত্রগুলোর ডাটা দ্রুত সেভ করে একটি ক্রিস্টাল ডিস্কে তথ্যগুলো কপি করে অফিস থেকে বেড়িয়ে পরে।

বাসায় ফিরে প্রথমে সিনাকে বলবে ।
সিনা নিশ্চয় খুব খুশি হবে।
ফ্রি জ্যাপে উঠেই লুইসের সিনার শখের ফনো কার্ডের কথা মনে পরে যায়।
উচ্চ শব্দে ফার্স্টবিটের মিউজিক চালিয়ে দিয়ে দ্রুত জ্যাপ ছুটিয়ে চলে লুইস।
সামনের একটি ফনোকার্ডের স্টলে জ্যাপ থামায়।
সবচেয়ে লেটেষ্ট কার্ডটি কিনে ফেলে সিনার জন্য।
আবার জ্যাপে উঠে সোজা বাসার পথ ধরে।

সিনা, সিনা, কোথায় তুমি।
মিলে গেছে সিনা, মিলে গেছে,
আমার দীর্ঘ দুই বছরের সাধনা আজ সফল হয়েছে।
আমার ইকুয়েশন মিলে গেছে।
কাল সাবমিট করব আশা করি।
সিনাও লুইসের সাথে আনন্দটুকু ভাগাভাগি করে নেয়।
এই নাও এটা তোমার জন্য।
কি এটার মধ্যে?
খুলেই দেখনা।
ওহ! লুইস
এটা আমি ভীষণ পছন্দ করি।
তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মানফি ফেদেরার, বিজ্ঞান একাডেমীর চার্জ অফিসার, সকল বিজ্ঞানীদের তৈরিকৃত নতুন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষা করে দেখাই তার কাজ।
ওহ! লুইস এতো দেখছি জাদু, তুমি যা করেছ তা সত্যিই চমৎকার। এটা বাস্তবায়ন হলে এটাই হবে সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

দশ বছর পেরিয়ে গেছে লুইস তার ফিউশন মেথড এর বাস্তবায়ন করে ফেলেছে ফলে পৃথিবীতে এখন মানুষের সর্বময় ক্ষমতা বিরাজ করছে। এখন পৃথিবীর সকল যৌগিক পদার্থকে কাজে লাগানো হচ্ছে। একটি তুচ্ছ জঞ্জালও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, রোবট সম্প্রদায় কেউ অনেক উন্নত করা হয়েছে, এখন আর ন্যালোটিয়াম ব্যাটারির জন্য কয়েকদিন পরেই ওগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলতে হয় না। ওরা হয়ে গেছে এখন অনেকটা মানুষের মত একবার জন্ম আর একবারই মৃত্যু। এক একটা রোবট এখন অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারবে, গড় আয়ু হবে প্রায় ছয়শ বছর করে। দুনিয়ার তাবৎ কাজ এখন রোবটেরা করে। এদের ধাতব মস্তিষ্কের ফিজিক্যাল মেমোরিতে ওয়ান ওয়ে রিড অনলি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বলে ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোন ভয় নেই। আর সকল প্রকার রোবটদেরকে একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের আন্ডারে এনে তাদের দিয়ে সকল কাজ করানো হয়। লুইসের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর থেকে মানুষের সকল চাহিদার অবসান হয়েছে বলে হ্যাকার দের পরিমাণ কমে এখন ০.০২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে তাই কেউ নিজের সুখ নষ্ট করতে ভাইরাস তৈরি করে না। মানুষের সিকিউরিটি ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত হয়েছে। প্রতিটি মানুষের ডিএনএ কোডিং থেকে ক্রাইমের তথ্যগুলোকে কি ভাবে পরিবর্তন করে ভিন্ন তথ্যতে রূপান্তরিত করা যায় তা আবিষ্কারের ফলে ক্রাইম নামক শব্দটি মানুষ এখন ভুলতে বসেছে। পৃথিবীর সার্বিক জলবায়ু ভারসাম্য রক্ষার্থে রোবটদের দিয়ে নিয়ন্ত্রিত বনায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, দূরীভূত হয়েছে সকল প্রকার পুরনো দুষিত ব্যবস্থা, তাই পৃথিবী এখন প্রতিনিয়তই নতুন পৃথিবীতে পরিণত হচ্ছে।

ভার্চুয়াল জীবন (অদ্ভুত জানালা)

মাঝারী বয়সের লোকজন তো আছেই সাথে শিশু আর বৃদ্ধরাও আছে। ব্যাস্ত ভাবে সবাই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। সকলের ব্যস্ত ভাব দেখে মনে হচ্ছে দুর পাল্লার ট্রেন বুঝি এখনই চলে আসবে,

আসলে এই জায়গাটা দেখতে অনেকটা রেল ষ্টেশনের প্লাটফর্মের মতই মনে হচ্ছে। বড় একটি রিসিপ্সন চেম্বার দেখা যাচ্ছে লোকজন ওখান থেকে কিছু একটা সংগ্রহ করছে। এরা কি সংগ্রহ করছে ? টিকিট ? না অন্য কিছু ? লম্বাটে মুখের ফর্সা কতগুলো মেয়ে ব্যস্ত ভাবে সকলের আইডি ভেরি ফাই করছে। ভেরি ফাই শেষে তাদের হাতে ছোট্ট একটি কার্ডের মত গুজেদিয়ে হাসি মুখে বলছে আপনার যাত্রা শুভ হোক। ধবধবে সাদা পোশাক আর মাথায় নীল রঙ্গের স্কার্ফ পরেছে এরা। পাশেই আরও এক সারি মেয়েরা বসে আছে এদের পোশাক একই শুধু মাথার স্কার্ফ টা হালকা গোলাপি। কিছু লোকজন এদের কাছে এসে ছোট্ট মত একটা কার্ড দিয়ে যাচ্ছে। এখানকার আসবাব, দেয়াল, ফ্লোর, রুফ সবকিছু ঘন সাদা বর্ণের হওয়ায় জায়গাটির পরিসীমা বোঝা যাচ্ছে না। লোকজন আসছে আবার সবাই চলে যাচ্ছে। আমি যে গেট দিয়ে এখানে এসেছিলাম সেখানে লেখা ছিল মিষ্টিরিয়াস উইন্ডো। এখানে ঢোকার পর আমি উইন্ডোতো দুরের কথা কোন ডোর ও দেখতে পাই নি। এখন বের হব কোথা দিয়ে তাও বুঝতে পারছি না। সবাই এতো ব্যস্ত যে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছি না। রিসিপশনের একটি মেয়েকে ফ্রি মনে হল। এই মেয়েটির মাথায় নীল স্কার্ফ। দীর্ঘদিনের মানসিক চিন্তার ফলে মুখে প্রচুর তিল হয়ে গেছে, ক্রিস্টালে আঙ্গুল ঘসতে ঘসতে নখের ডগা তীক্ষè হয়ে গেছে।

স্যার আপনার কার্ড প্লিজ।
ওহ ! শিয়র।
বায়ো ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে ব্যক্তিগত তথ্যগুলো ভেসে ওঠে।
নাম- মানফি ফেদেরার
বয়স- ৩৪
পেশা - সার্ভিস
পদবী- চার্জ অফিসার
প্রতিষ্ঠানের নাম- কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমী।

রিসেপশনিষ্ট মেয়েটি আমাকে একটি ছোট্ট কার্ড ধরিয়ে দিলো।
বুঝতে পারছি না আমি এটা দিয়ে কি করবো। কার্ডটির উপরে নিচে কিছু লেখাও নেই। আমার সাথে আরও একটি লোক একই কার্ড নিলো। আমি ওকেই অনুসরন করছি, ও আমার সামনে হাঁটছে। যতই সামনের দিকে এগুচ্ছি পেছনের সকল কিছু যেন অদৃশ্য হচ্ছে । পেছনের সকল কিছুর অদৃশ্য হওয়া দেখতে দেখতে আমি সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। যখন পেছনে আর কিছুই দেখা যায় না তখন আমি সামনের দিকে তাকিয়ে লোকটিকে আর দেখতে পেলাম না। ডানে বামে আশে পাশে কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। সামনে পেছনে এখন শুধু সাদা রং। আমি পা দিয়ে নিচের ফ্লোরে আঘাত করে দেখতে চেষ্টা করি ফ্লোরটা কতখানি পুরু ? লাফ দিয়ে উপরের ছাদটা ছুতে চাই। কিন্তু না কোন ভাবেই ছুঁতে পারছি না। উপায়ন্তর না পেয়ে সামনের দিকে হাটতে থাকি, বেশ কিছুক্ষণ হাটার পরে লক্ষ্য করলাম এখানে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। ব্যাগে থাকা ছোট্ট পানীয় এর বোতল থেকে একটু তরল মুখে ঢেলে দিতেই শরীরে প্রয়োজনীয় উষ্মতা অনুভব করলাম। পকেটে থাকা কার্ডটি বের করতেই সবুজাভ একটি আলো দেখতে পেলাম। আরে এটা তো একটি ম্যাপ, আমার গন্তব্য সম্পর্কিত তথ্য দেখাচ্ছে। এই ম্যাপের স্টার্ট পয়েন্ট থেকে আমি অনেক দুরে চলে এসেছি। সম্পূর্ণ পেছনের দিকে ঘুরে অনেক খোঁজা খুঁজির পর ইন্ড পয়েন্ট খুঁজে পেলাম। এখানে সাদা রংয়ের মধ্যে হালকা একটি চিলতে কালো রেখা দেখে মনে হল এখানে বোধ হয় ডোর আছে এগিয়ে যেতেই হালকা বাতাস সামনের দিকে বের করে ডোরটি খুলে গেল, আমি সামনের দিকে আগাতে থাকি। এখানে বাতাস এত বিশুদ্ধ যে আমার মধ্যে অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করলাম। এতক্ষণ সাদা রঙ্গের তীব্র আলোতে থাকার ফলে চোখ ধাঁদিয়ে ওঠে ছিল এখানে ভিন্ন ভিন্ন রং চোখে পড়ায় চোখে অদ্ভুত এক আরাম বোধ করলাম। জায়গাটি অনেক বড় হরেক রকমের ছোট ছোট বাহারি বৃক্ষ, হ্যাঁ বৃক্ষই কিন্তু এরকম বৃক্ষ ইতিপূর্বে কখনও দেখেছি কিনা তা মনে করতে পারছি না, সবকিছু এত সুন্দর মনোরম,

মন চাইছে শুধু তাকিয়ে থাকি। বৃক্ষগুলো যেন আমাকে দেখছে, পাশদিয়ে যখন যাচ্ছিলাম মনে হল এরা আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ফার্নিচার সুন্দর করে সাজানো। অসংখ্য রোবট আর সাইবর্গ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এরা আমাকে দেখতে লাগল।
ছয় মিনিট লেট, আপনি দেরি করে ফেলেছেন।
কথার ধরনটা এমন যেন আমাকে আগে থেকে ইনভাইট করা হয়েছিল সময় মত যোগ না দেওয়ার জন্য এখন জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যার কারণে আমতা করে বললাম:
আমি ডোর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।
আসুন মিঃ মানফি, মহামান্য রিশা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।
তিনটি সশস্ত্র রোবট এর গার্ডে আমি সামনের রোবটটিকে অনুসরন করে এগুতে থাকি।
বড় একটি ডোর চমৎকার কারুকার্য করা, ডোর এর সামনে যেতেই আমাকে কয়েকটি লেজার আপাদমস্তক স্ক্যান করে ফেলল। অসম্ভব এক সতেজটা অনুভব করলাম আমি, মনে হল এই মাত্র দীর্ঘক্ষণের শাওয়ার নিয়ে এলাম। কোন প্রকার শব্দ ছাড়াই ডোরটি খুলে গেল। ভিতরে অদ্ভুত সব ফার্নিচার আর নিখুঁত কারুকার্য আমার চোখকে সম্পূর্ণরূপে বেঁধে ফেলল। অর্ধস্বচ্ছ পলিমারে অস্পষ্টভাবে সামনে একটি নারী শরীরকে লক্ষ্য করলাম। সামনে এগিয়ে যেতেই চমকে উঠে থেমে গেলাম। এত সুন্দর মানবী এর আগে আমি কখনও দেখিনি। সব ভুলে অদ্ভুত চোখে ওর চোখে তাকিয়ে রইলাম।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ মানফি ।
সম্বিত ফিরে পেয়ে নিজেকে বশে আনলাম।
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের জন্য আপনাকে ডাকতে হল।
আপনার অফিসের সকল ক্যামেরা আর স্টাফদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখানে আনার জন্য মাফ করবেন। সেন্ট্রাল ইনফরমেশনাল ডাটাবেস মডিউলে সামান্য পরিবর্তনের জন্য আপনাকে আনা হয়েছে। কিছু

ইমেজ এবং ভিডিও ক্লিপ আপনাকে দেখানো হবে। এই স্মৃতিটা আপনাদের পৃথিবীতে একটি তথ্য আকারে পৌঁছানোর জন্য আমরা আপনাকে ব্যবহার করছি। আজ আপনারা বিজ্ঞান একাডেমীতে যারা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করছেন আপনাদের জন্মের পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল যে আপনারা বর্তমান পৃথিবীর কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমীতে কাজ করবেন। আর বিজ্ঞান একাডেমীতে যারা সদস্য পদ লাভ করে একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমে তাদের অলক্ষ্যে তাদের মস্তিষ্কে ক্ষুদ্রকায় চিপ সংযোজন করা হয়। আপনাদের মাধ্যমেই সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এই পৃথিবীকে পৃথিবী আকারে দেখে। একটি গুরত্বপূর্ন তথ্য এখানে মিসিং রয়েছে যা এই মুহূর্তে আপনাদের পৃথিবীর স্মৃতিতে যুক্ত করার প্রয়োজন পরেছে। তাই আমরা আপনার মাধ্যমে এই তথ্য পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। ধীর অঙ্গভঙ্গিমায় মেয়েটি তার আসন ছেড়ে আমার পাশে চলে আসে আমার হাত স্পর্শ করতেই অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করি, অনুভূতির এরকম কোন পর্যায় থাকতে পারে পৃথিবীর কোন মানুষ হয়তো কখনও অনুভব করেনি। মনে হচ্ছে যেন শরীরের সকল দুষিত উপাদান ছিটকে ছিটকে প্রতিটি হাত আর পায়ের আঙ্গুল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আপনি এখন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ এবং বিশুদ্ধ একজন মানুষ মিঃ মানফী। আপনাকে যে সকল ইমেজ ও ভিডিও দেখানো হবে সেগুলো আপনার মস্তিষ্ককে স্থায়ী ভাবে যেন ট্রান্সমিট হয় তার জন্য আপনার মস্তিষ্কের সিনাপ্সগুলোকে আরও কাছাকাছি আনতে নার্ভাল সিস্টেমে ও মস্তিষ্কের ফাইবারে কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে।

হাত সরিয়ে নিতেই নিজেকে এত হালকা আর প্রফুল্ল মনে হল যে, প্রতিটি বস্তুর গন্ধ, দৃষ্টিগোচর ও অগোচর সকল কিছু, আর শব্দ গুলো এত স্পষ্ট হয়েছে যে, আমি এখন যে কোন শব্দকে মাপতে পারছি। রংগুলো এত নিখুঁত যে ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত জীবন তাকিয়ে শুধু এই রং গুলোকেই দেখি। মেয়েটি আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমি হিপনোটাইজড এর মতো হয়ে তার পিছনে হাঁটছি। আমি হাঁটছি নাকি উড়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। আমার সকল ইন্দ্রিয় যেন কোন

এক মহা শক্তির করাল গ্রাসে হারিয়ে গেছে। সামনে ছোট্ট একটি জানালা দেখতে পেলাম, মোটা কালো পর্দায় জানালাটি বন্ধ রয়েছে। পেছনের আলোগুলো দ্রুত কোমল হতে হতে হালকা ছায়া ছায়া অন্ধকারে পরিণত হল। পর্দাটা আস্তে খুলতে থাকে কালো পর্দার পেছনে কিছুই দেখা যায় না শুধু জানালাটির দৈর্ঘ্য প্রস্তুর রেকটেঙ্গল মাপটি দেখা যায়। ধীরে খুব ধীরে অস্পষ্ট ভাবে ছোট ছোট আলোর অসংখ্য বিন্দু লক্ষ্য করা গেল, ধীরে ধীরে বিন্দুগুলো উজ্জ্বল হতে থাকে,

মহাকাশ!

এটা তো মহাকাশ!

হ্যাঁ মানফি এখন কোন কথা বলোনা শুধু দেখে যাও।

মহাকাশে বিভিন্ন রঙ্গের তারা দেখতে দেখতে সামনে দিকে ভেসে যেতে থাকি মনে হয় যেন কোন স্পেস শিপে চেপে দুর কোন তারকা লোক পারি দিচ্ছি। প্রথমে হালকা সব নক্ষত্র তারপর হরেক রকম তেজস্ক্রিয় নক্ষত্র এরপর সুপার নোভা তারপর কোয়েসার আর ব্ল্যাক হোলের ভয়াবহ আকর্ষণ পেরিয়ে সমুদ্রে সৃষ্ট সাইক্লোন এর মতো স্পাইরাল গ্যালাক্সির দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলতে থাকি। মাঝারি আকারের হলুদ আলো বিচ্ছুরনকারি নক্ষত্র আর তাকে কেন্দ্র করে আবর্তনকারী সব গ্রহ আর উপগ্রহ, আরে এটা কি ? এটা তো পৃথিবী। ধীরে ধীরে সন্মুখে যাওয়ার গতি মন্থর হয় পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে থমকে যায় গতি। স্থির ভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠ দেখতে বেশ ভাল লাগে। সামনে সমগ্র এশিয়ার চিত্র, ম্যাপে যেরকম দেখেছি এখান থেকে দেখতে তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর, কালচে সবুজ আর মাঝে মাঝে সরু সাদা সাদা রেখা, পাশে বিশাল অংশ নিয়ে হালকা নীল, এটা সমুদ্র। দেখতে এত ভাল লাগছে যে আমি নিজের কথা ভুলেই গেছি। হঠাৎ ভূ- পৃষ্ঠ হতে উল্কার মত শত শত ক্ষেপণাস্ত্র উঠতে থাকে পৃথিবীর আকাশে। একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায় সেই সকল বিভিন্ন আকারের উল্কা। বড় বড় আলো সৃষ্টি করে সবুজ পৃথিবীটাকে ধীরে ধীরে ছাই বর্ণে ঢেকে ফেলে। শক্তিশালী

স্যাটালাইট ক্যামেরায় যেমন ভূপৃষ্ঠের সকল কিছু দেখা যায় এখান থেকেও ঠিক সেভাবে জুম করে ভূ- পৃষ্ঠে কি হচ্ছে তা দেখানো হচ্ছে। আমরা আরও কাছাকাছি চলে আসি ভূ- পৃষ্ঠ থেকে ৩০/৪০ ফিট উপর থেকে দেখতে থাকি সক ওয়েভের আওতায় কোন কিছু অবশিষ্ট নেই আর সক ওয়েভেরও অনেক বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষ পিপড়ার মত ঘর ছেড়ে পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, কেউ মাঠে ছোটাছুটি করছে, কেউ চুপচাপ বসে আছে ভাবখানা এরকম যেন কোন বিশেষ কিছু উপভোগ করছে। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের ভয়ঙ্কর কান্না আকাশে বাতাসে ভয়াবহ এক শব্দ সৃষ্টি করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহে বিভিন্ন যায়গায় পরে আছে। দীর্ঘদিন ধরে লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে এতদিনের গড়ে ওঠা সমাজ পলকের মধ্যেই ছাই হয়ে আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। এত কিছুর মধ্যেও বেশ কিছু মানুষ বেঁচে আছে। পূর্বেই ভূগর্ভে তৈরিকৃত বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে তারা অবস্থান নিয়েছে। কারো মুখে কোন কথা নেই সকল মানবকুল যেন চিরস্থায়ী মুক ও বধির হয়ে গেছে। তাদের স্থির দৃষ্টির দিকে তাকালে বোঝা যায় কত বড় আকারের বীভৎসতা তারা উপলব্ধি করেছে। ধীরে ধীরে আলো নিভে যায় সামনের জানালাটির কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না, চোখের কোনে জ্বল মুছতে দেখে রিশা আমাকে বলল, আমরা এরকম কোটি কোটি সু- হৃদয়বান মানুষ এর জন্য সুন্দর একটি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি। জানালার পর্দাটা আস্তে আস্তে ঢেকে গেল। আমরা ধীরপায়ে রুম থেকে বেড়িয়ে আসি।

এলার্ম এর কর্কশ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধরমর করে উঠে বসি। এ আমি কি দেখলাম। গোটা স্বপ্নটা এতটাই বাস্তব যে, মনে হচ্ছে ঘুমানোর আগে আমি এরকম একটি জায়গা থেকে বেড়িয়ে এসেছি। আমার পেট রোবটের স্পিকার কণ্ঠে সম্বিত ফিরে পেলে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরি।

আপনার নার্ভাল সিস্টেমে কিছু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে মিঃ মানফি। সবার আগে আপনি আমার মস্তিষ্কের প্যারাইটাল লোবটি দেখুন।

গত রাত্রে আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তার সবগুলো ইমেজ দেখতে চাই মিঃ হেক প্লিজ আপনি আগে প্যারাইটাল লোবটি দেখুন,

সেটা দেখতে হলে প্রথমে নার্ভাল সিস্টেম, ভলান্টারী একটিভিটিস, সেরিবেলাম সিস্টেম তারপর ফ্রন্টাল লোব।

থামত আমি যা বলছি আগে তাই করো।

মাই গড। এরকম এর আগে আমি কখনও দেখিনি মিঃ মানফি।

আপনার লিমবিক সিস্টেম এ ইতিপূর্বে কি প্রবেশ করা হয়েছে?

হ্যাঁ আমি যখন একাডেমীর সদস্য হলাম তখন ওখানে একবার প্রবেশ করা হয়েছিল।

মানফি, আমি বাজি ধরে বলতে পারি এখানে দ্বিতীয় বার প্রবেশ করা হয়েছে। আপনি আমার প্যারাইটাল লোবটি আগে দেখুন না।

চোখ বন্ধ করে রাখুন, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখবেন।

একটু হেজিটেশন হতে পারে সময়কাল সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড।

বিভিন্ন যন্ত্রগুলোকে উপর নিচ করে মানফির মস্তিষ্কের ঠিক পেছনের দিকে একটি স্ক্যানার লাগিয়ে বায়ো ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে হেক।

আরে এই একই স্বপ্ন তো আমিও দেখেছি।

কিন্তু আমার মনে ছিল না।

বিশ্বাস করুন মিঃ মানফি এই একই স্বপ্ন আমিও দেখেছি। কবে দেখেছি তা আমার মনে নেই, কিন্তু আমি দেখেছি।

হেক এর কথাগুলো মানফির কাছে অসহনীয় যন্ত্রণার মত মনে হতে থাকে। তাকে এক্ষুনি সভাপতির সাথে দেখা করতে হবে।

হেক এর কাছ থেকে রিপোর্ট কার্ডটি নিয়ে সরাসরি সভাপতির কক্ষে হাজির হয় মানফি।

মানফির সকল কথা শুনে সভাপতি রিগ্যান ডিলো দ্রুত এক কনফারেন্স এর আয়োজন করেন।

আজ একটি বিশেষ মিটিং এ আপনাদেরকে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে। আপনারা সবাই একাডেমীর চার্জ অফিসার মানফি ফেদেরারকে চেনেন। কোন অজানা এক শক্তি আজ আমাদেরকে দুর্লভ কোন তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করছে। যে ম্যাসেজটার কথা আপনাদের বলব তা সত্যিকার অর্থেই বিস্ময়কর একটি তথ্য। সভাকক্ষে বড় আকারের একটি বায়ো ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে সম্পূর্ণ চিত্রটি দেখানো হল। সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

আমিও এই স্বপ্নটি দেখেছি,

আমিও দেখেছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও দেখেছি।

আমি যা ধারনা করেছিলাম তাই হয়েছে। আসলে আমরা সবাই এই একই স্বপ্ন দেখেছি। তার প্রমাণ হচ্ছে মানফির স্বপ্নটিকে আমরা তার মস্তিস্কের প্যারাইটাল লোব থেকে কপি করেছি। এবং সেখানে একটি পর্যায়ে যখন দেখানো হচ্ছিল যে বিভিন্ন লোকজন একদল রিসিপশনিষ্ট এর কাছ থেকে কার্ড সংগ্রহ করছে। আমরা ঐ লোক গুলোর ছবি আমাদের ডাটাবেসে সার্স করে দেখেছি। এই লোকগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দা তারা সকলেই এই স্বপ্নটা দেখেছে এবং টাইম ওয়ার্প করে আমাদের সকলকে বিভিন্ন জনের সাথে মিশিয়ে স্বপ্নটা দেখানো হয়েছে। আমরা কেউ কোন কারণে হয়তো এই স্বপ্নকে আমাদের অবচেতন মন থেকে বের করতে পারিনি কিন্তু মানফির স্বপ্নটি ছিল অবচেতন মনের সম্পূর্ণ বাইরে তাই সে স্বপ্নটির কথা সকালে উঠেই মনে করতে পেরেছে। বিশেষ একটি তথ্য এই স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। যা আমাদেরকে বের করতে হবে। ভাল করে দেখুন এখানে পৃথিবী ধ্বংসের চিত্র দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটি ব্যাপার আমরা বুঝতে পারছি না, এটা কি ভবিষ্যতে হবে ? নাকি ইতিপূর্বে হয়ে গেছে ? ইতি পূর্বে হয়ে থাকলে তার ইতিহাস আমরা জানতাম। এরূপ কোন তথ্য আমাদের কোন ডাটাবেস বা পূর্বকালের কোন বই পত্রেও দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এটা কি ভবিষ্যতে হবে ? তাহলে সেটা কবে ? আমরা অবশ্য এরই মধ্যে সম্পূর্ণ ভিডিও চিত্রের

কিছু ছবিকে স্ক্যান করে বিভিন্ন যায়গার সাথে মেলাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন ভাবেই তা মেলানো সম্ভব হয় নি। তবে ধ্বংস চলাকালীন সময়ে যে সকল মানুষ সেখানে ছিল তাদের পোশাক দেখে মনে হয়েছে এটা আজ থেকে প্রায় তিনশত বছর পূর্বেকার। তখন মানুষ ঐ রকম পোশাক পরিধান করত। কিন্তু তিনশত বছর পূর্বে পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপে পরিণত ছিল। তিনশত বছর তো দুরের কথা দুই হাজার বছর পূর্বের প্রায় সকল তথ্য আমাদের ডাটাবেসে আছে। অথচ এই ধ্বংস নিয়ে কোন প্রকার তথ্য আমাদের কাছে নেই। আর আমাদের সকল বিশ্ববাসীকে একসাথে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হল এর অর্থ কি ? ইতিমধ্যে আমরা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি টিম গঠন করেছি। বিষয়টির একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফল আমরা দেখতে চাই।

ভার্চুয়াল জীবন (এরর)

প্রচুর বৃষ্টি সাথে কাঠ ফাটা গোলাপি রং এর রোদ, আকাশে কোন মেঘ নেই। ভাল করে আকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আকাশের রং টকটকে লাল। গোটা পৃথিবী আজ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যেন; বৃষ্টির সাথে ছোট ছোট আগুনের দলা, কিন্তু কোথাও কোন ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে না । বৃষ্টি সাথে আগুন ঝরে ঝরে পরছে কিন্তু আগুনে কোন কিছু পুড়ে যাচ্ছে না। মানুষের শরীরেও আগুন লেগে যাচ্ছে কিন্তু আগুনে শরীরের কোন প্রকার ক্ষতি হচ্ছে না। সকলেই নির্বাক, কি হচ্ছে এসব, কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। এখন দুপুর অথচ হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, মধ্যরাত্রির অন্ধকারে শহরে জুরে আলো জ্বেলে দিল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট প্রতিষ্ঠান গুলো। মহাকাশ বিদরা অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে বিষয়টি

অনুধাবন করার চেষ্টা করে চলেছে। হলোগ্রাফিক টিভিতে প্রতি নিয়ত বুলেটিন প্রচারিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে দিন আবার পাশের শহরেই রাতের নিকষ কালো অন্ধকার, এর কোন ব্যাখ্যা নেই কোথাও। ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবী রাতের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। কোন কারণ ছাড়াই কিছু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোন রোগ ধরতে পারছে না। সব যেন অলৌকিক কোন এক জাদুকরের খেলা। ধর্মভীরুরা যার যার ধর্মের উপাসনায় প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পরেছে। বিভিন্ন গুজবে গোটা পৃথিবীটা যেন প্রতিনিয়ত গুজব বিশ্বে পরিণত হচ্ছে । মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই মাত্র বিশেষ বুলেটিনে ঘোষণা দিলেন মহাকাশের কোন কিছুকেই তারা লোকেট করতে পারছে না। পৃথিবী আর পৃথিবীর এই বৈরি পরিবর্তন ছাড়া বিশ্ব জগত বলতে কোন কিছু নেই। সরকারী ঘোষণায় ফ্ল্যাশ টিভি ছাড়া সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে যারা নাস্তিক নামের চাদর জড়িয়ে ছিল তারাও মনে মনে কোন এক সৃষ্টিকর্তাকে ডেকে চলেছে । সকলের মনে একই চিন্তা সকাল আদৌ হবে তো। রাতটা এভাবেই কাটতে থাকে কিন্তু সকাল আর হয় না। এখন সময় ১০ এ.এম কিন্তু আলোর কোন দেখা নেই। পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট কোম্পানিগুলো সমগ্র বিশ্ববাসীকে পাওয়ার অপচয় রোধে বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করতে শুরু করেছে। গবেষকরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও টক শো করে চলেছে। সমগ্র বিশ্ববাসী এখন বিভিন্ন স্যাটালাইট চ্যানেলের লাইভ অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। জরুরী বুলেটিনে বলা হল সদ্য স্বাধীন হওয়া ওলিসাস দেশের একটি শহরে মানুষ অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। সামান্য একটু আশ্রয়ের খোঁজে ঐ শহরে এখন মানুষ দিক-বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারের সাথে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠা বড়ই মুশকিল।

লুইস সিনাকে নিয়ে বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে একাডেমীতে অবস্থান নিয়েছে, সকলের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে স্যাটালাইট চ্যানেল

গুলোর দিকে। কিছু সময়ের জন্য সকল স্যাটালাইট চ্যানেল গুলো বন্ধ হয়ে গেল প্রতিটি মানুষের উদগ্রীব আর উৎকণ্ঠা যেন সর্বসীমা অতিক্রম করেছে। কিছু সময় পরে দেখা গেল চ্যানেল গুলো সচল হয়ে উঠেছে। যে মেয়েটি খবর পাঠ করছে অত্যন্ত দুঃখের সাথে সে জানালো সাইরিয়া নামক কোন দেশ এখন আর এই বিশ্বের মানচিত্রে নেই। এক্সক্লুসিভ একটি প্রোগ্রামে দেখানো হল মানুষগুলো কিভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ এলোমেলো ভাবে দিক্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ ক্যামেরায় একজন মানুষের ছবি দেখানো হচ্ছে; একটি লোক ভারাক্রান্ত ভাবে ফুটপাথের পাশ দিয়ে খোরাতে খোরাতে এগিয়ে যাচ্ছে, হাতে ছোট্ট একটি সার্স লাইট, ঘন অন্ধকারের মধ্যে লাইটের আলো তীব্র হলেও বস্তুর অবস্থান তেমন স্পষ্ট নয় বলে সামনে কি আছে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। পেছন থেকে সামনের দিকে আর সামনে থেকে পেছনের দিকে প্রথমে একটি করে আলো লোকটিকে আবর্তন করে ছুটে বেড়াতে লাগল। ধীরে ধীরে আলো দুটি বড় হতে লাগল এবং একটি থেকে তিনটি এবং তিনটি থেকে নয়টি এভাবে বাড়তে লাগল। লোকটি প্রথমে হতভম্বের মত বিষয়টি দেখতে থাকলেও পরবর্তীতে খোরা পা নিয়েই দৌড়াতে শুরু করল। লোকটি দৌড়ায় সাথে সাথে আলোগুলোও তাকে আবর্তন করে চলতে থাকে। অদ্ভুত নীলাভ আলো চারিদিকে এত আলো তৈরি করেছে যে লোকটি তার হাতে থাকা সার্স লাইট ফেলে আরও দ্রুত দৌড়াতে লাগল। খোরা পায়ে বোধহয় শক্ত কোন ধাতব লোহার সংঘর্ষ হয়ে লোকটি লুটিয়ে পরে গেল। এবার আলোগুলো আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকল। সবগুলো আলো যেন সেনাবাহিনীর সৈন্যদের ড্রিলের মত কোন একজন পাইলটকে অনুসরন করে চলছে। ধীরে ধীরে আলোগুলো উপর থেকে একটি একটি করে বৃষ্টির পানির ফোটার মত মানুষটির বুকের ঠিক মাঝখানে পরতে লাগল। লোকটি অবশ হয়ে যাওয়া প্যারালাইড রোগীর মত পরে রইল। সবগুলো আলো লোকটির বুকে পতিত হয়ে চকচকে সবুজ একটি আলোর বিন্দু তৈরি করলো, বিন্দুটি ধীরে ধীরে

বড় হতে লাগল, বড় হতে হতে একসময় চোখ ধাঁধানো আলোতে পরিণত হল। আলোগুলো বিস্ফোরণের মতো হয়ে চতুর্দিকে ছিটকে ছিটকে পরছে। পরে থাক খোরা মানুষটিকে আর দেখা গেল না। এই সম্প্রচার দেখার পরে গোটা পৃথিবীতে ভয় আর কান্নার রোল পরে গেল। ভিত সন্ত্রস্ত মানুষ একে অপরকে আঁকড়ে ধরে রইল। পর্যায়ক্রমে বুলেটিন গুলোতে একে একে দেশ এবং দেশ থেকে মহাদেশ নিশ্চিহ্ন হতে থাকল। সিনা এক মনে সৃষ্টি কর্তাকে ডেকে চলে। হঠাৎ বিকট শব্দ। সকলে একযোগে চিৎকার করে ওঠে।

ম্যাক্স তার সতর্ক ঘন্টা বাজিয়ে দিল আর সাথে সাথে কোন কোন ফ্লোরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা ফ্ল্যাশে দেখাতে লাগল। সিকিউরিটি অফিসার সকলকে সতর্ক করে দিয়ে জানালো উপরের দিকে আগুন লেগে গেছে সবাইকে এখনি নিচে নামতে হবে। নিচে নামার জন্য সমগ্র ফ্লোর জুরে গোলযোগ শুরু হয়ে গেল। রিগ্যান এর ধাতব কণ্ঠে সবাই নীরব হল।

বন্ধুগন আমাদের এখানে থেকে যেতে হবে। আমাদের জন্য নির্ধারিত একটি আশ্রয় কেন্দ্র আছে। আমরা সেখানেই যাবো। আপনারা কেউ হৈ চৈ করবেন না। সারিবদ্ধ ভাবে পঞ্চান্ন নম্বর ফ্লোরের টেম্পোরারি পোর্টে চলে আসুন।

আতঙ্কিত সিনার প্রশ্ন আমরা কোথায় যাচ্ছি লুইস।

আমি জানি না।

তবে মহামান্য সভাপতি নিশ্চয় আমাদেরকে কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমার খুব ভয় করছে লুইস।

১২০ নম্বর ফ্লোরের টেম্পোরারি পোর্টে সবই সমবেত হয়ে দাড়িয়ে আছে। উপরের ফ্লোরের আগুন এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কি ভয়ানক সেই আগুন, দেখলেই শরীরে রক্ত হিম হয়ে আসে। ছোট ছোট তিনটি আলো অনুভূত হল আলোগুলো ক্রমেই বড় হতে লাগল। আলোগুলো দেখে সিনা লুইসকে জরিয়ে ধরে।

আলো গুলো কিসের, বল- না কিসের আলো ওগুলো।

নির্বাক লুইসের কণ্ঠ আটকে আসে, কোন কথা বের হয় না।

ভয় পেওনা তোমরা সভাপতির ধাতব কণ্ঠে শান্ত হয় সবাই।

ওগুলো আমাদের তৈরিকৃত ডিয়াগা।

৩ টি অত্যাধুনিক ডিয়াগা এসে ল্যান্ড করল টেম্পোরারি পোর্টে। গত বছর বিজ্ঞান একাডেমীর ফ্লাইং ডিপার্টমেন্ট এই অত্যাধুনিক ডিয়াগাগুলো নির্মাণ করেছে। এটির জ্বালানী হিসেবে লুইসের ফিউশন মেথড ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অনির্দিষ্টকাল এটি আকাশে অবস্থান করতে পারে। সকলে সারিবদ্ধ লাইনে ডিয়াগায় উঠে পরল। শব্দ ছাড়া, বাতাসের উদ্দাম ছাড়া এত বড় যানটি কিভাবে আকাশে উড়ল কল্পনা করতে সিনার মাথা ঘুরে ওঠে। ডিয়াগা ছুটে প্রচণ্ড গতিতে। অনেক উপরে উঠে ডিয়াগাগুলো এবার সরাসরি ভূমির দিকে তাক হয়ে দ্বিগুণ গতিতে ছুটতে থাকল, অত্যাধুনিক স্যারন ওয়েভে থাকার জন্য প্রচণ্ড ত্বরণ কেউ অনুভব করতে পারল না। ছোট আকারের উল্কা পিণ্ড সাগরের জলে পতিত হলে সাগর পৃষ্ঠের পানি যেমন চারিদিকে ছিটকে যায় ঠিক সেভাবে ডিয়াগা তিনটি সাহারা এলাকার বিস্তীর্ণ মুরুঅঞ্চলে ডুব দিল। কতটা নিচে নামল তা বোঝা গেল না। একসময় মনে হল ডিয়াগাগুলি থেমে গেল।

এই ভূগর্ভে আমাদের জন্য পূর্বে তৈরি করা একটি আশ্রয় কেন্দ্র আছে এখানে আমরা নামব। কোন প্রকার হৈ চৈ না করে সকলে সকলের রুমে চলে যান, ধাতব কণ্ঠে সভাপতির আদেশে ডিয়াগার গেট খুলে যেতেই সবাই নেমে পরল। মানফী অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল আরে এটা তো আমাদের একাডেমীর এন্ট্রি টানেল। না এটি আমাদের পূর্বের একাডেমী না। এটাকে ঠিক আমাদের পূর্বের একাডেমীর আদলে তৈরি করা হয়েছে যাতে বিজ্ঞানীরা মনে করতে পারে যে তারা তাদের আগের যায়গাতেই আছে। এবং মন লাগিয়ে কাজ করতে পারে তাই এই ব্যবস্থা। একাডেমীর ভিতরের সবকিছু আগের মত করে সাজানো, সবকিছু চকচকে ঝকঝকে। এখানেও ম্যাক্স সকলের বডি স্ক্যান করে প্রবেশ করাল। কোন কিছুতেই কোন তফাত

নেই। লুইসের সবকিছু কেমন যেন মায়ার মত মনে হতে থাকে । কপালে হাত দিয়ে গদি আটা চেয়ারে বসে পরে। মাথা কেমন ঝিম ঝিম করছে, চোখে ঝাপসা দেখতে থাকে লুইস। সিনার হাতের স্পর্শ প্রচণ্ড শীতল বলে মনে হল, সারা শরীরে প্রচণ্ড উত্তাপ অথচ কপালে একটি শীতল হাত। স্লো সাউন্ড ট্রাকে কি সব শব্দ শুনতে পেল, তারপর সবকিছু অন্ধকার।

ভার্চুয়াল জীবন (প্রোগ্রাম রিসেট)

দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকলে শরীরে যেমন অবসন্ন ভাব হয় সে রকম একটি অবস্থা। মাথা উঁচু করার সময় অনুভূত হল মাধাটা ভীষণ ভারি হয়ে আছে। স্লাইডারে সময় দেখাচ্ছে এগারো এ.এম, সূর্যের তেজস্বী কিরণ ক্রিস্টাল গ্লাস ভেদ করে ঘরে ঢুকে পরেছে। এত সময় পর্যন্ত লুইস কখনও বিছানায় ঘুমিয়ে থাকেনি, সিনাও গভীর ঘুমে অচেতনের মত ঘুমিয়ে আছে। সিনাকে ঘুমিয়ে থাকলে অসম্ভব সুন্দর দেখায়, মেয়েটি এত সুন্দর হল কি করে ভাবতে থাকে লুইস। সম্বিৎ ফিরে পেলে এতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকে। সকাল নয় টার বেশি কখনই সে ঘুমাতে পারে নি, অফিসে যাওয়া বা অন্যান্য কাজ সম্পর্কে তার পেট রোবট সবসময় তাকে ডেকে দিয়েছে কিন্তু আজ কি হল কিছুই বুঝতে পারছে না। দ্রুত কন্ট্রোল এর দিকে এগিয়ে যায়, নাহ! অফিস থেকেও কোন ম্যাসেজ বা কোন মেইলে জমা পড়েনি, পেট রোবটের রিসেন্ট আইটেমেও কোন ইনস্ট্যান্ট ম্যাসেজ নেই। দ্রুত বিটা নেটের মাধ্যমে অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে যেয়ে লক্ষ্য করে নেটওয়ার্ক ফেইলর হয়ে আছে। ইতিপূর্বে নেটওয়ার্ক ফেইলর এর নাম শুনলেও ফেইলর কখনও দেখেনি। কি করবে কিছু বুঝতে পারে না লুইস। কিছু একটা গোলমাল অনুভব করে। নিজের প্রতি কেমন যেন একটি অবিশ্বাস ভর করে ওর। গত কালের কোন স্মৃতিও মনে করতে পারে না। সিনাকে ডেকে তোলে, লুইসের ডাকে জেগে ওঠে সিনা কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার ফলে

বসে বসে ঝিমাতে থাকে, লুইসের কোন কথাই ভালভাবে ওর কানে পৌঁছল না। হঠাৎ পেট রোবট থেকে বিপ বিপ শব্দ আসতে থাকে, লাল রং এর বাতি জ্বলতে থাকে, অর্থাৎ এই ম্যাসেজটা খুবই জরুরী। ইনভিসিবল স্পিকারে জানানো হল গত রাতে মহাকাশ থেকে আসা সিরা ফিন- ৩৪ ভাইরাস সমগ্র মানবকুলকে আক্রমণ করেছে তাই দ্রুত সকলকে এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিতে বলা হচ্ছে। লুইস সিনাকে নিয়ে ফ্রি জ্যাপ বের করে দ্রুত অফিসের দিকে রওনা হয়, অসংখ্য ফ্রীজ্যাপ ছুটে চলেছে দেখলে মনে হবে যেন পৃথিবীর সকল ফ্রীজ্যাপ বুঝি আজ একযোগে চলতে শুরু করেছে। অফিসের গেটে আসতেই সিকিউরিটি জানালো সকল স্টাফ সেন্ট্রাল হাসপাতালে চলে গেছে এবং আপনাকেও ওখানে যেতে বলা হয়েছে। লুইস সেন্ট্রাল হাসপাতালের দিকে ছুটতে থাকে। বিভিন্ন কার্যালয়ের হাজার হাজার মানুষ অসংখ্য লাইনে দাড়িয়ে আছে। ইনভিসিবল স্পিকারে সিভিল সার্জন সাহেব সকলকে ধৈর্য সহকারে ভ্যাকসিন নিতে বলছেন। প্রত্যেকটি অফিসের সভাপতিরা তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিজস্ব স্টাফদেরকে একত্রিত করে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য বলছে। কানের মধ্যে কোমল কণ্ঠে সভাপতি রিগ্যানের কণ্ঠ ধ্বনিত হল, লুইস এদিকে চলে এস আমরা চৌত্রিশ নম্বর টার্মিনালের সামনে আছি দ্রুত চলে এস। পরিচিত সকল স্টাফদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সকলেরই একই সমস্যা গতকালের কোন কিছুই তারা মনে করতে পারছে না। সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রোবটরা প্রত্যেককে ভ্যাকসিন দিচ্ছে। সাথে ১২ ঘণ্টা নিরেট ঘুমের একটি করে পাফ। একটা বিষয় খেয়াল করার মতো চারিদিকে কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব, ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া যেন একটা আনন্দের ব্যাপার। অনেক পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা হল, সবার সাথে কথা বলে বাসায় চলে আসে ওরা। মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করছে, খুবই ক্লান্ত লাগছে, ঘুমে চোখ ভারি হয়ে আসছে, বিছানায় যেতেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পরে ওরা।

ভার্চুয়াল জীবন (সীমানা)

বিজ্ঞান একাডেমীর কনফারেন্স রুমে সভা বসেছে।
সভাপতি রিগ্যান ডিলো খুব মন দিয়ে লুইসের বক্তব্য শুনছেন।

মাননীয় সভাপতি এবং সম্মানিত অন্যান্য সভাসদ।
আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন গ্রহণ করুন।
আজ আমরা একটি বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের আজকের বিষয় "ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড" এই বিষয়ে আমাকে আপনাদের সামনে বক্তব্য উপস্থাপন করতে অনুমতি দেওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। সম্মানিত সভাসদ আপনারা জানেন, বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সময় অতিবাহিত করছে। আজ মানুষের প্রায় সকল চাওয়া পাওয়ার অবসান হয়েছে, মানুষ রোগ শোক থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, প্যারা- ইরেজিং পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মগজ থেকে সকল প্রকার দুষিত চিন্তা দুর করা সম্ভব হয়েছে, ফিউশন ম্যাথড আবিষ্কারের ফলে সকল প্রকার যৌগিক পদার্থকে কাজে লাগিয়ে জ্বালানী সংকটকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রজাতির রোবটদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত বনায়ন করে সকল প্রকার দূষণ মুক্ত করা হয়েছে। তবুও আমরা মানুষ এখনও কোন এক অজানা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছি। এত কিছুর পরেও আমরা সকল প্রকার চাওয়া পাওয়াকে জয় করতে পারিনি। হয়তো এটাই মানুষের বৈশিষ্ট্য, হারানোর বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দ না থাকলে বোধ হয় মানুষ যন্ত্রে পরিণত হতো। এই সকল অনুভূতিই বুঝি যন্ত্র থেকে মানুষকে আলাদা করেছে। সর্বোপরি আমরা একটি জরিপ

চালিয়ে দেখেছি ফিউশন ম্যাথড সমাধানের পর থেকে সমগ্র পৃথিবীকে একটি নতুন সাজে সাজানো হয়েছে। তাই আজ মানুষের আশি ভাগ অভাব মোচন করা সম্ভব হয়েছে। আর অভাব যখন কমে এসেছে তখন মানুষ সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে বিরত হতে পেরেছে। আজ মানুষ আর একা নয়, প্রতিটি মানুষ আজ প্রতিটি মানুষের পরম আত্মীয়তে পরিণত হয়েছে। এখন মানুষ এই পৃথিবীতে আরও বেশি দিন বাঁচতে চায়। আমাদের জিনেটিক বিজ্ঞানীরা অমরত্বের জন্য চেষ্টা চালিয়ে অনেকাংশে সফল হলেও বিজ্ঞান একাডেমী থেকে তার অনুমোদন দেওয়া হয় নি। কারণ মানুষ এই পৃথিবীতে যখন জন্ম নেয় তখন প্রকৃতির নিয়মে তাকে মৃত্যু বরন করতেই হবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়মকে অনেকবার ভেঙ্গে ফেলার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে অমরত্ব লাভের আশায় বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন, কিন্তু না, আমরা প্রকৃতির নিয়মকে ভাঙ্গতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির সকল রহস্য আজো আমরা উদঘাটন করতে পারি নি। কিন্তু আমরা আজ মানুষের আয়ুকে দীর্ঘ করতে পারি। জীবনটাকে তার স্বপ্নের মত করে সাজিয়ে দিতে পারি। আমাদের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের গড় আয়ু পঁচানব্বই বছর, যা স্বল্প একটি সময়। এই স্বল্প সময়ে মানুষ অনেক কিছুই পায় আবার অনেক বেশি হারায়। পৃথিবী যেহেতু সৃষ্টিকর্তার নিয়মে চলে সেহেতু মানুষ এখানে সব দিক থেকে স্বাধীন নয়। কিন্তু আমাদের এই প্রজেক্টটি মানুষের সকল স্বপ্ন পূরণ করে তার মনের মত একটি পৃথিবী গড়তে সক্ষম। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আমরা একজন মানুষকে অন্তত পাঁচশত বছর স্বপ্নের মত করে উপভোগ করার ক্ষমতা দিতে পারি। এটা হবে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিটি মানুষের ইচ্ছার উপর। যদি কেউ সাধারণ ভাবে থাকতে চায় তাহলে সে সাধারণ ভাবেই থাকবে। আর যদি কেউ চায় যে, সে পৃথিবীতে বেশি দিন বেঁচে থাকবে পৃথিবীটাকে সে তার ইচ্ছামত সাজাবে, তাহলে আমরা তাকে এই প্রজেক্টের আওতায় আনতে পারি। বিভিন্ন বিষয়ের একদল বিজ্ঞানীরা একটি টিম গঠন করে আজ এই

অসাধ্যকে সাধন করতে পেরেছেন। তারা প্রজেক্টটি সম্পর্কে একটি ফ্লো- চার্ট তৈরি করেছেন। আপনারা এটি পর্যবেক্ষণ করে আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করবেন আশা করি। আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, সকলকে ধন্যবাদ।

বিজ্ঞান একাডেমীর চার্জ অফিসার মানফি ফেদেরার প্রজেক্টটির উপর তৈরিকৃত ফ্লো- চার্টটি বায়ো ইলেক্ট্রো ফ্ল্যাশে প্রদর্শন করে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

এটি একটি নিউরাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

অসংখ্য অত্যাধুনিক প্রসেসর এই নেটওয়ার্ক তৈরিতে ব্যবহৃত হবে।

সকল প্রসেসরকে নিয়ন্ত্রণ করবে একটি শক্তিশালী সুপার- ভি- ৭২২ কম্পিউটার,

আজকের পৃথিবীর সকল মানুষের স্মৃতি নিয়ে বর্তমান পৃথিবীর আদলে তৈরি হবে একটি ভার্চুয়াল পৃথিবী। এই ভার্চুয়াল পৃথিবী এত নিখুঁত হবে যে, যখন কোন মানুষকে ঐ ভার্চুয়াল পৃথিবীতে পাঠানো হবে তখন সে ঐ পৃথিবীকে সত্যিকার পৃথিবী বলে মনে করবে। সেখানে মানুষের সকল সীমাবদ্ধতাকে জয় করে শৃংখলহীন একটি পৃথিবী তৈরি করা হবে। এই প্রজেক্টে আসতে একজন মানুষকে কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর এই যোগ্যতা অর্জন করতে তাকে বর্তমান পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে অন্তত ত্রিশ টি বছর অতিবাহিত করতে হবে। এই ত্রিশ বছর বয়সে তাকে যে কোন বিষয়ে শিক্ষিত হতে হবে। যদি কেউ বিয়ে করতে চায় তাহলে এই ত্রিশ বছরের মধ্যেই করতে হবে। এবং এই সময়ের মধ্যে সন্তান গ্রহণ করতে হবে। এক কথায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর সকল কাজ শেষ করতে হবে। এরপর তাকে তার সকল ইনফরমেশন আমাদের কাছে দিয়ে, কিছু টেস্ট করে, টেস্ট এ উত্তীর্ণ হতে হবে। এরপর সে এই প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এই প্রজেক্টে মানুষের গড় আয়ু ধরা হয়েছে পঁচানব্বই বছর। বর্তমান বিশ্বে ত্রিশ বছর অতিবাহিত করলে বাকী

থাকে পঁয়ষট্টি বছর। এই পঁয়ষট্টি বছর সময় নিয়ে তাকে আমাদের প্রজেক্টে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সে তার পৃথিবীটাকে কেমন ভাবে চায় তার একটি ভিজুয়াল তথ্য তার মস্তিষ্ক থেকে নেওয়া হবে। ঐ ভার্চুয়াল পৃথিবীতে সে তার সঙ্গে কাকে কাকে চায় তাদের ক্যারেক্টার তৈরি করে তাকে আমাদের প্রজেক্টের উদ্ভাবিত হাইপার টাইম টিউবে রাখা হবে। এই হাইপার টাইম টিউবে তার গড় আয়ুর মধ্যে থাকা অবশিষ্ট পঁয়ষট্টি বছরকে সাত গুন বাড়িয়ে দেবে। তাহলে দেখা যাবে যে সে ঐ ভার্চুয়াল পৃথিবীতে চারশত পঞ্চান্ন বছর অতিক্রম করতে পারবে যদি তার আয়ু গড় আয়ুর চেয়ে বেশি হয় তাহলে সে বেশি দিন বাঁচবে আবার কম হলে কম দিন বাঁচবে। আবার কেউ যদি এরূপ চায় যে, সে একটি নির্দিষ্ট সময় এই হাইপার টাইম টিউবে থাকবে তারপরে আবার বর্তমান বিশ্বে ফিরে আসবে তাহলে সেটাও সম্ভব। তবে একবার টিউব থেকে বের হওয়ার পর সে পুনরায় ঐ ভার্চুয়াল জগতে যেতে পারবে না। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে লুইস তার বক্তব্য শেষ করল। প্রচণ্ড করতালিতে ফেটে পরে কনফারেন্স রুম। সকলে উঠে দাড়িয়ে এই প্রজেক্ট এর আর্কিটেক্ট ও সকল সদস্যকে সম্মান জানায়। সবশেষে সভাপতি তার বক্তব্য পাঠ করেন এবং সকলের ভোট বিচার করে এই প্রজেক্টটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মতি জানান।

প্রতিটি পরিবার থেকেই রেসপন্স আসতে থাকে, পৃথিবীর প্রায় পঁচাশি শতাংশ মানুষ ভার্চুয়াল জগত সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করল। ফলে সরকার থেকে আর্থিক অনুদান পেয়ে প্রজেক্টের কাজ দ্রুত গতিতে কাজ এগিয়ে চলল। বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রজেক্টে অর্থ বিনিয়োগ করল। ধীরে ধীরে সেই স্মরণীয় দিনটি মানুষের হাতের নাগালে চলে আসল। শুরু হল বিভিন্ন টেস্ট, নির্দিষ্ট মানুষের বাছাই কাজ চলতে থাকল। অবশেষে একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে পৃথিবীর কিছু সংখ্যক মানুষকে ভার্চুয়াল জগতে পাঠানো হল। এভাবে ধীরে ধীরে প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন মেয়াদে ভার্চুয়াল জগতে যেতে থাকল। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ডুবে থাকল এই সৃষ্টি আর পৃথিবী

নামক মায়ার বন্ধনে। কিন্তু আসল বিষয়টি সবার অলক্ষ্যে থেকে গেল, তারা কেউই জানে না যে তারা কেউই রিয়েল মানুষ নয়, তারা নিজেরাই আছে তার চিন্তার মত একটি ভার্চুয়াল জগতে আর একটি ভার্চুয়াল জগতে থেকে তারাই আবার আরও একটি ভার্চুয়াল জগত তৈরি করেছে। হয়তো ঐ ভার্চুয়াল জগতেও তৈরি হয় অন্য কোন ভার্চুয়াল জগত এভাবেই চলতে থাকে মানুষের অস্তিত্ব।

প্রশ্ন আর উত্তরঃ

আমরা জানি পৃথিবীতে এ যাবত যত মানুষ এসেছে আর আসবে তাদের সকলকে একবারে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। আর এই সকল মানুষ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময় নিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে যাচ্ছে, সঙ্গে কিছু কাজ এবং কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তী প্রজন্মকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ধীরে ধীরে পরিণত করে তুলছে, এভাবে পরবর্তী প্রজন্ম আবার পরবর্তী প্রজন্মকে...। একজন মানুষ পৃথিবীতে আসার পূর্বে কেমন ছিল? কোথায় ছিল? এরূপ কোন তথ্য তার স্মৃতিতে থাকে না, মৃত্যুর পরে কি হবে বা কোথায় যাবে এরূপ কোন পরিষ্কার তথ্যও মানুষের স্মৃতিতে নেই। মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখে সে তার ইচ্ছামত সকল কাজকর্ম করতে পারে। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে মানুষের আসলে পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছায় করার কিছুই নেই, একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সু-শৃঙ্খল প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকল অস্তিত্ব এখানে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমরা যখন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্নে আমাদের সাথে বাস্তব পৃথিবীর মত একটি পৃথিবী থাকে, সেখানে আমাদের পরিচিত অনেক মানুষ থাকে, সেখানে আমরা একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করি, স্বপ্নে আমরা হাসাহাসি করি, কান্নাকাটি করি, স্বপ্ন আমাদের কাছে নিখুঁত বাস্তব বলে মনে হয় বলেই আমরা এভাবে হাসাহাসি করি, কান্নাকাটি করি, । স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আমরা স্বপ্নকে মস্তিষ্কের চেতন ও অবচেতন মনের বিভিন্ন স্তর দিয়ে তুলনা করি। আসলে যখন স্বপ্ন দেখি তখন সবকিছু বাস্তব। স্বপ্নœ শেষ তো সবকিছু নকল। যখন স্বপ্ন দেখি তখন কিন্তু আমরা এটা জানিনা যে আমরা স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নের জগতটাই

তখন আমাদের কাছে চিরন্তন সত্য বলে মনে হয়। স্বপ্ন ছাড়া কোন বাস্তব জগত আছে বা থাকতে পারে এরূপ কোন চিন্তাই তখন আমাদের মাথায় আসে না। একটা ব্যাপার এখানে লক্ষণীয়, যখন আমি স্বপ্নে থাকি তখন আমি ছাড়া স্বপ্নের সকল কিছু নকল। স্বপ্নে অনেক চরিত্র থাকে স্বপ্ন শেষ হলে সেই চরিত্র গুলোর বিলুপ্তি ঘটে অর্থাৎ স্বপ্নে আমার অস্তিত্ব ছাড়া সকল অস্তিত্বই ছিল নকল, আবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আমার অস্তিত্ব আসল অর্থাৎ স্বপ্নেও আমি আসল আবার বাস্তবেও আমি আসল। স্বপ্নের মধ্যে আমার সাথে যে চরিত্রগুলো ছিল সেগুলো যে নকল এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি এখন স্বপ্ন থেকে বাস্তবে এসে আমার সাথে অন্য যে চরিত্রগুলো রয়েছে এরা আসল না নকল সেটাই আমার প্রশ্ন।

আমরা আমাদের জন্মের পূর্বের কোন স্মৃতি সম্পর্কে অবগত নই। মৃত্যুর পরে কি হবে তাও জানিনা। পৃথিবীতে আসার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবী বলে কোন কিছু আমাদের কাছে ছিল না। যখন আমরা মারা যাবো তখন থেকে পৃথিবী নামক ছোট্ট শব্দটিও আমাদের থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে আর সাথে সাথে এই পৃথিবীর সকল চরিত্র যারা আমার সাথে ছিল। স্বপ্ন শেষে কোন চরিত্রের যেমন কোন মূল্য নাই তেমনি বাস্তবেও একজন মানুষের মৃত্যুর পরে এই সকল চরিত্রের কোন ভিত্তি নাই প্রত্যেকটি চরিত্র নকল। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমার সাথে যে চরিত্রগুলো আছে বা ছিল তারা কিন্তু আবার তাদের জন্য বরাদ্দকৃত পৃথিবীতে আসল, সেখানে হুবহু আমার মত দেখতে একটি নকল চরিত্র আছে, তার সবকিছু আমার মত কিন্তু সেটা আমি নই, সেখানে আমার পৃথিবীতে থাকা সকল মানুষ আছে সবাই নকল শুধু একজন আসল। এভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রের জন্য আলাদা আলাদা পৃথিবী আছে সেখানেও আমি আছি আমার অস্তিত্বের অসংখ্য কপি রয়েছে প্রত্যেকটি পৃথিবীতে। এই সকল পৃথিবীতে আছে অনেক ভাল ভূমিকার চরিত্র আবার আছে অনেক নোংরা কুৎসিত ভূমিকার চরিত্র। ভালো হোক আর কুৎসিত হোক আসলে নিজের চরিত্রটিকে সঠিক

ভাবে উপস্থাপন করে নিজের কাছ থেকে এবং অপরের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের প্রত্যেকটি অস্তিত্বের কাজ। কারণ প্রতিটি অস্তিত্ব যখন চূড়ান্তভাবে সকল মায়ার বন্ধন থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবে তখনই কেবল একটি অস্তিত্ব মুক্তি লাভ করবে। পূর্নাঙ্গ চরিত্রের প্রতিটি অস্তিত্ব তাঁর ভীষণ দরকার।

২য় খণ্ডের কাজ চলছে.....

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান (আলিফ)
ফরিদপুর।
০১৭১২- ২৫৬৮৯৬।